Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে আগত পীর আওলিয়াগণের দাওয়াত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ ২৩০৯০১২০৩৩৯

-- নভেম্বর,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে আগত পীর আওলিয়াগণের দাওয়াত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ ২৩০৯০১২০৩৩৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশে আগত পীর আওলিয়াগণের দাওয়াত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ ২৩০৯০১২০৩৩৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে আগত পীর আওলিয়াগণের দাওয়াত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

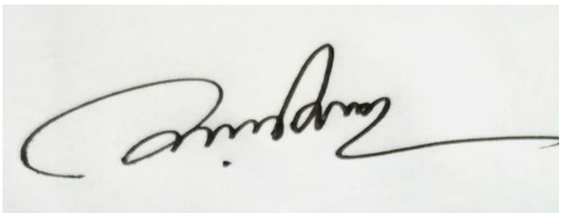

তারিখঃ ২০-১১-২০২৫

-- নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ ২৩০৯০১২০৩৩৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.১ ভূমিকা : 5
১.২ দাওয়াত কি ও কেন: 6
১.৩ ওলি-আউলিয়ার পরিচয় : 9
অধ্যায় ২ ইসলামপূর্ব বাংলার সামগ্রিক চিত্র 10
২.১ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান : 10
২.২ বাংলার সাথে আরবের নৌ যোগাযোগ: 11
২.৩ বাংলার প্রবেশদ্বার: 12
২.৪ আর্য শাসক ও বৌদ্ধ প্রজার রাজনৈতিক সংঘাত: 13
২.৫ সামাজিক অবক্ষয়: 16
অধ্যায় ৩ : ইসলামের শ্বাশ্বত বাণী নিয়ে আগত পীর-আউলিয়াগণ: 21
৩.১ বিভিন্ন অঞ্চলে আগত উল্লেখযোগ্য আউলিয়াগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 22
অধ্যায় ৪ : প্রভাবশালী অলি-আউলিয়ার জীবন ও কর্ম : 24
৪.১ হযরত শাহজালাল মুজাররাদ রহ (সিলেট) 24
আগমন : 25
আগমনের কারণ ও রাজা গৌড় গোবিন্দের সাথে যুদ্ধ: 27
৪.২ : রাজশাহী ও হযরত শাহ মখদুম রুপোশ রহ: (১২১৬-১৩১৩ খ্রি) 33
আগমনের অন্তরালে এক বিস্তৃত ইতিহাস : 34
দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : 36
ইসলাম প্রচার : 37
৪.৩ : নুর কুতুবুল আলম (চট্টগ্রাম) 40
রাজা গণেশের অত্যাচার : 44
গণেশের ছেলের ইসলাম গ্রহণ : 45
মৃত্যু : 45
৪.৪: শাহ সুলতান বলখী রহ: মাহিসওয়ার (বগুড়া) 46
সংক্ষিপ্ত পরিচয় : 46
দাওয়াতি কাজ: 47
৪:৫ বাবা আদম শহীদ (রহঃ) (মুন্সিগঞ্জ) 48
বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধ ও শহীদ উপাধি: 49
৪.৬ জালালুদ্দিন তাবরিজী 51
বাংলায় আগমন: 52
ইসলামের প্রচার-প্রসার: 53
প্রভাব বিস্তার: 54

ইন্তেকাল : 54
৪.৭ খান জাহান আলী (যশোর-খুলনা) 57
দক্ষিণবঙ্গ বিজয় : 58
ইসলাম প্রচার : 59
ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র: 59
যোদ্ধা পরিচয়ে আগমন 61
অধ্যায় ৫ : অলি-আউলিয়ার দাওয়াতী কার্যক্রমের পদ্ধতি 62
৫.১ মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকা স্থাপন: 62
৫.২ লঙ্গরখানা চালু 63
৫.৩ ইলমের আলোকচ্ছটা: 64
৫.৪ শাসকবর্গকে নসীহত : 64
৫.৫ বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদে অংশগ্রহণ: 65
অধ্যায় ৬ : যাযাবর বেদে সম্প্রদায় 65
অধ্যায় ৭ : উপসংহার 68

অধ্যায় ১:

১.১ ভূমিকা :

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি বিশ্বজাহানের রব। তিনি আমাদেরকে আলোকিত করেছেন দ্বীন ইসলামের দ্বারা। আজি হতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশতপূর্বে রুক্ষশুষ্ক আরবে তিনি তার মহিমান্বিত কুরআনকে নাজিল করেছিলেন। আল্লাহর হাবিব হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত সেই কুরআনের বাণী ছিল রুক্ষ মরুভূমির বুকে শীতল ঝরনাধারার মত, যেন পাতলের অন্ধকার গহব্বরের মধ্যে সূর্য কিরণ প্রবেশের ন্যায়।
ইসলাম একটি আলো ও জ্যোতি। যেখানে অন্ধকার ইসলামের আলো সেখানেই প্রবেশ করে। ইসলাম একটি আদল, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে জুলুম, শোষণ, অন্যায় ও অত্যাচারে মানুষের জীবন ও পরিবেশ জর্জরিত সেখানে ইসলামের আগমন হয় শান্তি, মৈত্রী, সাম্য ও ইনসাফের বাণী নিয়ে। সূর্যের আলো যেমন সমগ্র জমিনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পরে আলোকিত করে তেমনি ইসলামের নূরও জাজিরাতুল আরব থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভূখন্ডে। এবং সূদুর আরব হতে একসময় সহস্র মাইল পেরিয়ে ইসলাম এসে পৌঁছেছিল জল কাঁদা-মাটির এই বাংলায়। ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখি প্রথম এই অঞ্চলে আরব বণিকদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রবেশ ঘটে। কিন্ত তৎকালীন বাংলার সামগ্রিক চিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী যারা ছিলেন তারা হলেন সেই সকল কিংবদন্তি যাদের আমরা পীর আউলিয়া বলে অভিহিত করি। সমুদ্র ও স্থল উভয় পথেই তারা বাংলায় এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় এদেশে আগত সেই সকল সূফী, দরবেশ, আলিম, পীর আউলিয়ার অবদান সুবর্ণখচিত। স্বাভাবিকভাবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অনেক অলৌকিক ঘটনার আলোচনাও রয়েছে তবে এখানে এ সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম তার বিজয়ের জন্যে যেমন কোনো তরবারির মুখাপেক্ষী নয় তেমনি কোনো কারামাত বা অলৌকিক ঘটনারও মুখাপেক্ষী নয়। ইসলাম তার অন্তরের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই মানুষের হৃদয় জয় করে। কারামাত এ বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করে মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এটি দুর্বল

হৃদয় জয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু ইসলামের অন্তর্নিহিত দুর্বার সত্যই আসল কাজ করে যায়।
এই গবেষণায় সেই সকল মহান পীর আউলিয়ার আগমন, তাদের দাওয়াতি কর্মকাণ্ড এবং সমাজ ও জনজীবনে তাদের প্রভাব ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির ওপরে দৃষ্টিপাত করা হবে।

১.২ দাওয়াত কি এবং কেন:

ইসলামী দা'ওয়াত চিরন্তন ও শাশ্বত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি ফরয কাজ। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলই পৃথিবীতে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষদেরকে নিরলসভাবে দা'ওয়াত দিয়েছেন। উম্মাতে মুহাম্মাদী হিসেবে আমাদেরকেও এ কাজে অংশগ্রহণ করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। এছাড়া প্রকৃত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করার জন্যও দা'ওয়াতী কাজের কোন বিকল্প নেই। এজন্য ইসলামে এটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।
ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম আহকাম বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ। দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পথে এগিয়ে যায়। রাসুল (সা.) জীবনব্যাপী দাওয়াহ এর কাজ চালু রেখেছিলেন এবং তাঁর রাফিকুল আ'লার নিকট গমনের পর তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ দাওয়াতের এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। এরপর তাঁদের পরবর্তী সকল মুবাল্লিগে দ্বীনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে দ্বীন ইসলাম সমগ্র বিশ্বে একটি পরিচিত ও বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দাওয়াহ এর উদ্দেশ্যঃ (غرض الدعوة الإسلامية)

ইসলামী দাওয়াহ বা দাওয়াহ ইল্লøাহ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রেজামন্দি তথা সন্তুষ্টি অর্জন করা। দাওয়াহ এর কাজ হবে কেবলমাত্র আল্লাহর দিকে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -)سورة النحل- "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহবান কর। (সুরা নাহলঃ ১২৫)

والله يدعوا الى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم –)سورة يونس (

"আল্লাহ চিরস্থায়ী শান্তির বাসস্থানের দিকে আহবান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সুরা ইউনুসঃ ২৫)

শুধুমাত্র দাওয়াত নয় বরং সকল কাজ তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদী কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা সকল মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো-

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين - لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين –)سورة الأنعام (

" বল আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ্ব, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এর প্রতি অনুগত থাকার আদেশ পেয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। (সুরা আনয়ামঃ ১৬২-৬৩)

প্রত্যেক মুসলিম যখন সালাত আদায় করবে সে সময়ও আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে মূখ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বানী-

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود-)سورة الفتح (

" আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত হতে দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুটিত থাকবে।" (সুরা ফাতহঃ ২৯)

মুসলমানদের সর্ব অবস্থায় আল্লাাহর সন্তুষ্টি কামনা করা আবশ্যক। আল্লাহর বানী-

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد)سورة البقرة (

" মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি করে। আল্লাহ তাঁর ইবাদতকারীদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল।" (সুরা বাকারাঃ ২০৭)

দান সদকা ইত্যাদীর ক্ষেত্রেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। আল্লাহর বানী-

وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله)سورة بقره (

“ যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমরা নিজেদের কল্যানেই ব্যয় কর। কেননা তোমরা তো তা আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্যই ব্যয় করে থাক।” (সুরা বাকারাঃ২৭২)
সকল ধরণের পরামর্শ যা ভালো কাজের উদ্দেশ্যে তাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার বিষয়ে কুরআনী নির্দেশ-

لا خير فى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما)سورة النساء (

“ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি দান করার আদেশ দেয়, ভালো কাজ করার ও মানুষের মধ্যে সুস্পর্ক প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয় সে ব্যক্তির আদেশে কল্যাণ আছে। যে ব্যক্তি এ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে, আমি অবশ্যই তাকে মহা পুরষ্কার প্রদান করব। (সুরা নিসাঃ ১১৪)

ইসলামী দাওয়াহ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে পরিচালিত হয়। ইতিহাসবেত্তাদের মতে ৮ম শতক থেকেই এই অঞ্চলে ইসলামের গুঞ্জন শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সাগর ও স্থলপথে অসংখ্য পীর আউলিয়া ইসলামের মশাল হাতে এদেশে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এবং তারই ফলশ্রুতিতে আজকে পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা নিজেদের তথা বাংলাদেশকে দেখতে পাই একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে।

১.৩ ওলি-আউলিয়ার পরিচয় :

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা আল কুরআন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলাম নাজিল করেছেন। এটি নাজিল করা হয়েছে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না এবং আর কোনো আসমানি কিতাব ও নাজিল হবেনা এবং এটিই চলমান ও কার্যকর থাকবে। এই জীবন বিধান বা দীনকে চলমান ও কার্যকর রাখার দায়িত্ব খোদ আল্লাহতায়ালাই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর দেওয়া এই ধর্ম ও জীবন বিধানের সংরক্ষণ ও প্রচারে প্রিয় নবী ﷺ নিজে তার সাহাবা, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়িগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অবদান রেখে গেছেন ।এক্ষেত্রে উলামার ভূমিকাও প্রাতঃস্মরণীয়। মানবসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আউলিয়ায়ে কিরাম। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনবিদিত। মানবতার কল্যাণে তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। তাদের সংস্পর্শে মানুষ ধন্য হয়, কল্যাণ লাভ করে।

অলি (ولي) শব্দের অর্থ- বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, নৈকট্যশীল। অলির বহুবচন আওলিয়া । ওলি আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় "আউলিয়া" শব্দটি "ওলি'র বহুবচন। ওলি' অর্থ বন্ধু, মিত্র বা অনুসারি, মুরব্বী, অভিভাবক । কখনো শব্দটির অর্থ হয় শাসক, অভিভাবক বা কর্তা। প্রসিদ্ধ অভিধান "আল-মাওয়ারিদ"অনুসারে ওলি শব্দের অর্থঃ guardian, patron, friend, companion ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে "ওলি" এবং "আউলিয়া" এ উভয় শব্দটির ব্যবহার হয়েছে অসংখ্য বার) আল্লামা মাসউদ (رحمة الله عليه) বলেন – অলী (أَوْلي) শব্দটি একবচন যার বহুবচন আউলিয়া (أَوْلِيَاءَ)। আর ঐ সকল মহামনীষীদেরকে ওয়ালীউল্লাহ বলে যারা ইসলামে খালেস ও মুখলেছ এবং সর্বদা আল্লাহ তাআলার মারেফত ও প্রেমে বিভোর। তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরত পরিদৃষ্ট, কর্ণ সমূহে আল্লাহর আয়াতাবলী ধ্বনীত এবং তাদের মূখে যিকরুল্লাহ ব্যাতীত অন্যকিছু ইচ্ছারিত হয় না।

আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি (رحمة الله عليه) মসনবী শরীফে বলেন –

"নূরে হক্কে জাহের বুয়াদ আন্দর অলী
নেকবী বাসী আগার আহলে দিলি"।

অলী যিনি হবেন তার মধ্যে আল্লাহর নূর সুস্পষ্ট দীপ্তমান হবে
তুমি স্বচ্ছ দিলওয়ালা হলে তা দেখতে পারবে।

আল কুরআনের আলোকেঃ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদার সকল! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল পাক ﷺ এঁর আনুগত্য কর এবং ওলিল আমরগণের আনুগত্য কর।

[সুরা নিসা,আয়াত নং ৫৯]

অধ্যায় ২ ইসলামপূর্ব বাংলার সামগ্রিক চিত্র

২.১ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান :

প্রাক-ইসলামিক যুগে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান:

ইসলাম আগমনের আগে বাংলা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের এক স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল, যা নদী–নালা, উর্বর সমতলভূমি, জঙ্গল ও উপকূলীয় জলাভূমির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই অঞ্চলকে প্রাচীনকালে গাঙ্গেয়-ব-ডেল্টা (Ganges-Brahmaputra Delta) নামে অভিহিত করা হতো, যা বিশ্বের বৃহত্তম নদীনির্ভর বদ্বীপগুলোর অন্যতম।

১. ভৌগোলিক পরিধি ও প্রাচীন নাম

প্রাক-ইসলামিক কালে বাংলা বিস্তৃতভাবে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—

(১) বঙ্গ : বর্তমান বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল,উপকূলীয় অঞ্চল,
নদীমাতৃক জনপদ নৌ-যোগাযোগ
ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ

(২) গৌড় : বর্তমান রাজশাহী–পশ্চিমবাংলার নদীয়া–মুর্শিদাবাদ–মালদহ অঞ্চল
সমতল ভূমি, কৃষি ও নগর সভ্যতার কেন্দ্র।

(৩) সমতট : সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত
পার্বত্য জনপদ ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ছিল
ভারত-আরব-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌপথের প্রবেশদ্বার।
এ তিনটি অঞ্চল মিলেই ছিল প্রাক-ইসলামিক "বাংলা"।

২.২ বাংলার সাথে আরবের নৌ যোগাযোগ:

ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকেই আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে পারদর্শী হবার এবং বাণিজ্যোপলক্ষে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কারণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের সত্য বাণী দুনিয়ার বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এক একজন ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে এক একজন ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
বাংলা ও আরবের নৌ-যোগাযোগ মূলত ভারত মহাসাগর-নির্ভর সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে। নবম-দশম শতাব্দী থেকেই এই অঞ্চল দুটি একে অপরের সাথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। নিচে বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উদ্ভব ও প্রসার:

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত মহাসাগর ছিল বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ। আরব উপদ্বীপের বণিকরা পারস্য উপসাগর থেকে গুজরাট, মালাবার এবং বাংলা উপকূল পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করত।
এই বাণিজ্যপথগুলো মৌসুমি বাতাস (Monsoon Wind) ব্যবহার করে পরিচালিত হতো, যা নৌযাত্রাকে বিশেষভাবে সহজ করে দেয়।
বাংলা তখন পূর্ব ভারতীয় উপকূলের এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আরব বণিকদের জন্য বাংলার প্রধান আকর্ষণ ছিল— উৎকৃষ্ট মানের মসলিন, সূক্ষ্ম রেশম, নানা ধরনের মসলা, চিনি, গুড়, চাল, মোম, হাতির দাঁত, নীল, লাক্ষা, সূক্ষ্ম কারুকাজ।
এগুলো আরব, পারস্য ও পূর্ব আফ্রিকার বাজারে অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন ছিল।

আরব বণিকরাও বাংলায় নিয়ে আসত— খেজুর, মূল্যবান ধাতু, মুক্তা, সুগন্ধি দ্রব্য, ঘোড়া (বাংলায় যুদ্ধ ও প্রশাসনের কাজে ঘোড়ার ব্যাপক চাহিদা ছিল)।

আরব বণিকরা তাদের ব্যবসায়িক যাত্রার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের নীতি-আদর্শ বাংলায় পরিচিত করে তোলেন।
তাদের সততা, ব্যবসায়িক ন্যায়পরায়ণতা এবং সামাজিক আচরণ স্থানীয়দের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কালের প্রবাহে সুফি সাধক, দরবেশ ও আলেমরা সরাসরি বাংলায় আগমন করেন।
চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, সাতকানিয়া, খুলনা, বরিশালসহ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রথম মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে সমাজসেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ এবং মানবিক আচরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেন, যা আরব-বাংলা যোগাযোগকে স্থায়ী রূপ দেয়।

২.৩ বাংলার প্রবেশদ্বার:

ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিজরি প্রথম শতকেই ভারতীয় উপমহাদেশে তথা মালাবারে ইসলামের আগমন ঘটে এবং বাংলায় ইসলাম আগমনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় চট্টগ্রাম অঞ্চল।
বঙ্গেপসাগরের উপকূলীয় জনপদ চট্টগ্রাম। এই উপকূল দক্ষিণে কক্সবাজার ও টেকনাফ পর্যন্ত প্রলম্বিত। ধারণা করা হয় যে, আরব বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে যাতাযতের সময় চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে যাত্রাবিরতি করেন। সেই সূত্রে পুরো এলাকা ছিল তাদের অবতরণ ও অবস্থানস্থল। এ সময়টিতেই মিয়ানমার অর্থাৎ আগের বার্মার আরাকান অঞ্চলেও আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের পদচারণা ছিল। তবে এই অঞ্চলে কখন ইসলামের আগমন ঘটেছিল তা সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা কঠিন। এখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থান ও মানুষের নাম ইত্যাদিতে আরবির যেমন প্রভাব আছে, তেমনি ফারসির প্রভাবও লক্ষণীয়। তবে অনুমানের ভিত্তি ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবের মুসলমান বণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আর সেই সূত্র ধরে বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ‘খ্রিষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনাগোনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের আগে ‘না’ সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবি ভাষার প্রভাবের ফল। অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা, যেমন- আলকরণ, সুলুকবহর, বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবি নাম বহন করে।’
ড. আবদুল করিমের এই বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম দিয়েই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। এ কারণে চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়। সেই সুবাদে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ইসলামাবাদ।

২.৪ আর্য শাসক ও বৌদ্ধ প্রজার রাজনৈতিক সংঘাত:

প্রাক-ইসলামিক যুগে বাংলা অঞ্চল ছিল দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই অঞ্চলে আর্য শাসকশ্রেণি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, স্থানীয় উপজাতি-সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংঘাত ও সহাবস্থান মিলিয়ে একটি অনন্য রাজনৈতিক ইতিহাস গড়ে ওঠে। বিশেষত প্রাগুক্তর বৈদিক প্রভাব, প্রাক-মৌর্য নগরায়ণ, মগধ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাব, এবং পাল-অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর উত্থান—এসবই বাংলা অঞ্চলে আর্য শাসক ও বৌদ্ধ জনসমাজের সম্পর্ককে বহুমাত্রিক করেছে।

১. বাংলা অঞ্চলে আর্য প্রভাব ও রাজনৈতিক কাঠামো

গবেষণা দেখায় যে গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পূর্বাঞ্চল—অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গ—খুব ধীরে ও সীমিত ভাবে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করে।
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈদিক সংস্কৃতি এখানে প্রবেশ করলেও তা কখনো মধ্য গঙ্গা উপত্যকার মতো প্রাধান্যশীল বা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে পারেনি (Rhys Davids 1903; D. C. Sircar 1971)।

খ্রি.পূ. প্রথম সহস্রাব্দে বঙ্গ জাতি, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় ইত্যাদি অঞ্চলে স্থানীয় গোত্রপ্রধানদের শাসন চলত।
বৈদিক ব্রাহ্মণরা এ অঞ্চলে সীমিত প্রভাব রাখত এবং অনেক সময় স্থানীয় শাসকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হতো (Niharranjan Ray 1980)।
ফলে বাংলা অঞ্চলে আর্য শাসকশ্রেণির আধিপত্য ছিল বিচ্ছিন্ন, এবং তাদের ক্ষমতা সবসময়ই স্থানীয় শক্তি ও নবউদীয়মান ধর্মীয় গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জের মুখে থাকত।

২. বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও জনসমর্থন

বাংলা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ছিল দ্রুত, গভীর এবং বহুমুখী। এর কারণ—

(ক) বৌদ্ধধর্ম বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা অস্বীকার করে সমতা ও ন্যায়কে গুরুত্ব দেয়।

(খ) বঙ্গ অঞ্চলের মূল জনগোষ্ঠী—বণিক, কারিগর, কৃষিজীবী, নৌকারিগর, ও আঞ্চলিক গোষ্ঠী—সমতাভিত্তিক ধর্মের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।

(গ) নগর ও বাণিজ্যশ্রেণির উত্থান বৌদ্ধ সংঘের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে (S. K. Saraswati 1975)।

অশোকের শাসনামলে বাংলার পুন্ড্রবর্ধন ও সমতটে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বৌদ্ধ বিহারগুলো রাজনৈতিক অর্থে 'গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাকেন্দ্রে' পরিণত হয়।

৩. রাজনৈতিক সংঘাতের মূল ক্ষেত্র

(ক) সামাজিক-ধর্মীয় বিরোধ

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধ নীতির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছিল—

ব্রাহ্মণ্যধর্ম জন্মগত বর্ণকে প্রধান করে,

বৌদ্ধধর্ম ছিল সমতাভিত্তিক ও বর্ণনিরপেক্ষ।

বাংলায় যেহেতু আর্য-ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দুর্বল ছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রসার স্থানীয় শাসক ও ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর জন্য আদর্শিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিযোগিতা

বৌদ্ধ বিহারগুলো ছিল—

জমিদানপ্রাপ্ত,

শিক্ষাকেন্দ্র,

বাণিজ্যপৃষ্ঠপোষক,

এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগে সম্পৃক্ত।

এগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে শুরু করলে আর্য শাসকশ্রেণির উদ্বেগ বৃদ্ধি পায় (T. W. Rhys Davids 1894)।

(গ) রাষ্ট্রক্ষমতার পুনর্বিন্যাস

মৌর্য–পরমৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেলে বাংলার স্থানীয় আর্য শাসকদের ক্ষমতা কিছু অঞ্চলে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।
উদাহরণস্বরূপ, মহাস্থানগড়–এ পাওয়া বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (৩য়–২য় শতাব্দী খ্রিস্টপূর্ব) এ নির্দেশ করে যে বৌদ্ধ সংঘ স্থানীয় শাসনবৃত্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল।

৪. পাল যুগ: বৌদ্ধ প্রজার রাজনৈতিক উত্থান বনাম ব্রাহ্মণ্য প্রতিরোধ
বাংলা অঞ্চলে আর্য শাসক বনাম বৌদ্ধ জনশক্তির দ্বন্দ্ব সবচেয়ে স্পষ্ট হয় পাল যুগে—

পাল রাজাদের উৎপত্তি ছিল নিম্ন/অ-আর্য বংশ থেকে (D. C. Sircar)।
প্রথম পাল সম্রাট গোপালকে নির্বাচন করেছিলেন "প্রজা"—অর্থাৎ বৌদ্ধ-সমর্থিত জনসংগঠন। পালরা রাষ্ট্রীয়ভাবে মহাযান, বজ্রযানসহ বিভিন্ন বৌদ্ধধারা পৃষ্ঠপোষকতা করে। পাল শাসন ব্রাহ্মণ্যধর্মভিত্তিক আর্য-রাজনৈতিক ধারার এক বিকল্প মডেল তৈরি করেছিল। গুপ্তোত্তর ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী এতে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং পরবর্তী সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান ঘটে—যা সরাসরি পাল-বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে (Niharranjan Ray; R. S. Sharma 2001)।

৫. প্রাক-ইসলামিক বাংলায় দ্বন্দ্বের পরিণতি

আর্য শাসক–বৌদ্ধ প্রজার এই দীর্ঘমেয়াদি টানাপোড়েনের ফলে—

(ক) বর্ণব্যবস্থা এখানে কখনো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমনটি উত্তর ভারতে হয়েছিল।

(খ) বাংলার রাজনৈতিক কাঠামো বৌদ্ধ—স্থানীয়—আর্য মিশ্র মডেলে পরিণত হয়।

(গ) বৌদ্ধ অধ্যয়নকেন্দ্র (নালন্দা-পার্শ্ববর্তী বিক্রমশীলা, সোমপুর মহাবিহার, জগদ্দল) বাংলা অঞ্চলে ক্ষমতাবলয়ের অংশ হয়ে ওঠে।

(ঘ) সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান দেখা গেলেও বৌদ্ধ ঐতিহ্য পুরোপুরি বিলীন হয়নি; বরং এটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণে রয়ে গেছে।

(ঙ)এই দ্বন্দ্বই পরবর্তীতে মুসলিম আগমনের সময়ে বাংলার সমাজকে আরো গ্রহণযোগ্য ও পরিবর্তন-উন্মুক্ত করে তোলে।

২.৫ সামাজিক অবক্ষয়:

ষষ্ঠ শতকের বাংলায় আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্য সমাজনীতি অর্থাৎ বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তখন বাংলাদেশে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ

সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সমাজের শীর্ষে স্থান লাভ করেছিল। ভগবানের পরেই ছিল ব্রাহ্মণের স্থান। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, গো-দান, জল-দান প্রভৃতি অন্য বর্ণের লোকদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন পূজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন, যাগ-যজ্ঞের পৌনপুনিক আচরণাদি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এ ছিল যথার্থ রূপ।

একদিকে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতি এভাবে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হতো, তাঁদের ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তো এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীতে চলতো নিদারুণ অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। চর্যাপদের কবি ঢেণ্ডনপাদ ৩৩ নং চর্যায় এ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সকরুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন :

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী হাড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।"

অর্থাৎ টিলার উপর আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্যই (ক্ষুধার্ত) অতিথি এসে ভিড় করে।

ব্রাহ্মণরা সমাজে যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন বৌদ্ধ রাজাদের শাসনামলেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কারণ তৎকালীন বৌদ্ধরা বেদ বিরোধী হলেও আর্য সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। আর্য সংস্কারের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধ রাজারা সেই সামাজিক ঐতিহ্যের স্রোতে বাঁধ দিয়ে নতুন সমাজ বিধান প্রণয়ন ও জন-জীবনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার দুঃসাহস বা সৎসাহস দেখাতে পারেন নি। এ জন্যই বৌদ্ধ আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধ বিপ্লব ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাস বা বর্ণাশ্রম রীতিকে আঘাতও করেনি। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, অর্থদান, গ্রামদান অব্যাহত ছিল।

বৌদ্ধরা কোনো নতুন সমাজ গঠনে সক্ষম না হবার কারণে এহেন ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো। শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণী দলিত ও নিগৃহীত হচ্ছিল। তারা ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা রাজকার্য, শাস্ত্রপাঠ, যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব বহন করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন দখল করে বসেছিল। আর শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তাদের ব্রাহ্মণদের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হতো। ব্রাহ্মণরা তাদের অধ্যাপনা ও তাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে পারতেন না। তাদের অন্নগ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান অমান্য করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। শহরের প্রান্তে টিলায় ঘর বেঁধে অন্ত্যজরা বাস করতো। তাদের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণদের পাপ হতো ।

সামাজিক কদাচার ও নৈতিক অধঃপতন

তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সামাজিক কদাচারের জন্যও অনেকাংশে দায়ী। যেমন বিবাহ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোক কোনো ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারতো না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের যে কোনো রমণীকে বিবাহ করতে পারতেন। তবে এ স্ত্রীর মর্যাদা কোনোক্রমেই ব্রাহ্মণীর সমান বলে স্বীকৃত হতো না। জীমূতবাহন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন : ব্রাহ্মণ নিজের সঙ্গে বিবাহিত নয় এমন নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করলে বা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গদোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না; সেই দোষও আবার সামান্য মনস্তাপ প্রকাশ করলেই খণ্ডিত হয়। ব্যভিচারকে এভাবে একটা নিয়মের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই বেঁধে দেন। ব্রাহ্মণদের অনুকরণে সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি নিজেদের মধ্যে এবং তাদের নিম্নতর বর্ণের লোকদের মধ্যে একটা নিয়মের প্রাচীর গড়ে তুললো। এ নিয়ম সমাজে সুস্পষ্ট নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিল। বাৎস্যায়ন পরিষ্কারভাবে বলেছেন, গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরে মহিলারা নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কামচর্চা, কামষড়যন্ত্র ও কামসম্ভোগ করতেন।

সমাজের নৈতিক অধঃপতনে মদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সেকালে মদের দোকানে মদ বিক্রি হতো। মদের দোকানের গায়ে চিহ্ন লাগানো থাকতো, যা দেখে খদ্দের সেখানে আসতো। এ ছাড়া অনেকে নিজের বাড়িতেই মদ তৈরি করতো। মদ তৈরির উপাদান রূপে চর্যাপদের একটি কবিতায় চিকন বাকল ও কঙ্গুচিনার উল্লেখ পাওয়া যায়।
বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি ও অধিকার বঞ্চিত ব্রাহ্মণেতর মানুষের নিদারুণ হাহাকার, অন্যদিকে ঐশ্বর্যবিলাস ও কাম-বাসনার উচ্ছ্বাসময় আতিশয্য। অধিকার বঞ্চিত মানবতা কোথাও একটু আশার ক্ষীণ আভাও দেখছিল না। চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র সুগভীর অন্ধকার। একটুখানি আশা, এক টুকরা আলো তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা ও মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা : আর্থিক প্রাচুর্য

খৃস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের দ্রাবিড় ও অনার্য জাতিরা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলেই আর্যরা তাদেরকে দাস বলতো। নদী-বিধৌত পলিমাটির দেশ হবার কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

গড়ে উঠেছিল এতে সন্দেহ নেই। এ দেশের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করতো। গ্রামের চারপাশের জমিতে তারা নানারূপ শস্য, ফলমূলাদি উৎপাদন করতো ।

সম্ভবত রাজাই ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। যারা জমি চাষ করতো বা অন্য প্রকারে জমি ভোগদখল করতো তাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট কর দিতে হতো। রাজা মন্দির ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করার জন্য জমি দান করতেন। এ জমির কোন কর দিতে হতো না। বংশানুক্রমে গ্রহীতারা এগুলো ভোগ-

দখল করতে পারতো ।

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশেষ করে খৃস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিল। বস্ত্রশিল্প ছাড়াও প্রস্তর, ধাতু ও মৃৎ শিল্পও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। বিলাসিতার উপকরণ যোগাবার জন্য স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি শিল্পও উন্নতি লাভ করেছিল। কর্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ করতো এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানা উপকরণ যোগাতো। কাষ্ঠশিল্প ও হস্তিদন্তের কাজও উন্নতি লাভ করেছিল। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। দেশে-বিদেশে বাংলার এ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। বিশেষ করে সপ্তম শতকের পূর্বে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য এ তিনটিই ছিল বাংলাদেশের ধনোৎপাদনের প্রধান নির্ভর কৃষিও সমাজে ধনোৎপাদনের কিছুটা উপায় হিসেবে স্বীকৃত ছিল কিন্তু ধন উৎপাদন ও ধন বণ্টনের উপায় হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের। অষ্টম শতক থেকে শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য কমে আসে এবং কৃষি-নির্ভরতা বেড়ে যায়। ফলে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সামাজিক মানও নেমে আসে।

সমাজের অভ্যন্তরে দারিদ্র্য ও শোষণ

কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর পরিমাণে বেড়েছিল। এ ঐশ্বর্যে ধনীর ধনাঢ্যতা ও বিলাস-আড়ম্বর বৃদ্ধি পেলেও এবং রাজপরিবার, রাজ কর্মচারী ও ব্রাহ্মণ সমাজের উদর স্ফীত হলেও বাংলার সাধারণ মানুষ এ থেকে লাভবান হয়নি। এর একমাত্র কারণ সামাজিক অবিচার ও অসম ধন-বণ্টন পদ্ধতি । এ পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনে যাদের ভূমিকা ছিল শূন্যের কোঠায় সেই ব্রাহ্মণ সমাজই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল। আর সাধারণ মানুষ হয়েছিল শোষিত ও নির্যাতিত। সাধারণ মানুষ ছিল করভারে জর্জরিত। এ কর রাজপুরুষদের পক্ষ থেকে নেওয়া হতো, ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকেও নেওয়া হতো। এ ছাড়াও ছিল চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারী এবং আচারান্ধ সমাজপতিদের নিদারুণ বিধান—এ সবের সর্বগ্রাসী পীড়ন, অবিচ্ছিন্ন অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের নির্মম আঘাতে ভূমিহীন, অর্থ-সম্বলহীন, সামাজিক সম্মানহীন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবস্থা ছিল

কল্পনাতীত। অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর 'চর্যাপদ' গ্রন্থে 'সদুক্তি কর্ণামৃত' থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করে তৎকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের করুণ ছবি অঙ্কন করেছেন । ২০ একটি শ্লোকে জনৈক নাম পরিচয়হীন বাঙালি কবি তাঁর সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের চিত্র নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন :

ক্ষুৎকাম শিশবঃ শবা ইব তনুমন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো সাং তথা বাধতে । গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটায়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপান্তি প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সুচিং যথা যাচিতা

অর্থাৎ-শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-বান্ধবেরা প্রীতি বর্জিত, পুরানো জীর্ণপাত্রে স্বল্প মাত্র পানি ধরে-এ সবও আমাকে তেমন কষ্ট দেয়নি, যেমন দিয়েছিল, যখন দেখেছিলাম করুণ হাসি হেসে গৃহিণী কাপড় সেলাই করার

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত চর্যাপদগুলোয় বাঙালি গৃহের এ নিদারুণ দারিদ্র্যের ছবি আরো করুণভাবে ফুটে উঠেছে। চর্যায় বিভিন্ন সময়ের মোট ২৩ জন কবির কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ কবিতাগুলোর অন্তর্নিহিত হতাশা পাঠক চিত্তকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দারিদ্র্য সমাজের বৃহত্তম অংশে পরিব্যাপ্ত ছিল বলেই চর্যার কবিদের কাব্যে এ হতাশা ও শূন্যতার বোধ ছড়িয়ে আছে। এ কবিতাগুলোর প্রায় সর্বত্রই দুঃখ ও নিরানন্দের ব্যথাময় সুর অনুরণিত। কবি ঢেণ্ডনপাদ ৩৩ নং চর্যায় বলেছেন:
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী । হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ। দুহিল দুধু কি বেন্টে ঘামাঅ !
অর্থাৎ—টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি) আসে। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে (ব্যাঙের অসংখ্য ব্যাঙাচির ন্যায় আমার সন্তান সংখ্যা ক্রমবর্ধমান)। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (যে খাদ্য প্রস্তুত তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)। এই একটি কবিতাতেই তৎকালীন বাঙালি গৃহের দারিদ্র্যের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
প্রাক ইসলামিক যুগের বাংলার সামগ্রিক চিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় চরম সামাজিক ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। একইসাথে নিম্নবিত্তের অর্থনৈতিক পরাধীনতা ছবিও স্পষ্টরুপে প্রকাশ পায়।

অধ্যায় ৩ : ইসলামের শ্বাশ্বত বাণী নিয়ে আগত পীর-আউলিয়াগণ:

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রচারের ঢেউ চলতে থাকে। তবে এর গতি সব সময় সমান থাকেনি। এ প্রেক্ষিতে এ সাত'শ বছরকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।
প্রথম পর্যায় অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পর্যায়কে যদি ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর বলা যায়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায় ও চতুর্দশ শতককে বলতে হয় ইসলাম প্রচারের যৌবনকাল এবং পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এ প্রচারের ধারা মন্দীভূত হতে থাকে। নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি এ সময় ইসলাম প্রচারের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও আলিমগণের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও আলিমগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকে একাকী এ দূরদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত-অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্য কম দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু বাংলার আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "দেশটি ভিজা ও অন্ধকার এবং খোরাসানবাসীদের মতে ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণ দোযখ।"

প্রথম যুগের অনেক সূফী-আলিম সমুদ্রপথে এ দেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্রপথ আরবদের কাছে সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাই ছিল এর মূল কারণ। সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশের মধ্যে

বঙ্গ-বদ্বীপে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অভূতপূর্ব সাফল্যের এ-ও একটি প্রধান কারণ। এ সূফী ও আলিমগণের সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের সংখ্যা শতের সীমা পেরিয়ে যে হাজারে পৌঁছেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। অনেকের কেবলমাত্র নামটুকুই জানা যায়। আবার অনেকের নামটুকু জানাও সম্ভবপর হয়নি। প্রথম দিকে যেসকল আউলিউয়াগন মহান পরিব্রাজক বেশে আগমন করেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন : হযরত শাহজালাল রহি:, মাখদুম শাহ রুপোশ, খান জাহান আলী, শাহ সুলতান বলখী, জালালুদ্দিন তাবরিজী প্রমুখ।

৩.১ বিভিন্ন অঞ্চলে আগত উল্লেখযোগ্য আউলিয়াগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	**দাওয়াতী অঞ্চল**	**সময়কাল**
শাহ সুলতান বলখী	হরিরাম নগর, ঢাকা। মহাস্থানগড়, বগুড়া।	.৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ
বাবা আদম শহীদ	বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ	১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
জালালউদ্দিন তাবরীজি	পান্ডুয়া, মালদহ	১২১৬ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ মখদুম রুপোশ	রাজশাহী	১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
বায়েজিদ বোস্তামী	চট্টগ্রাম	৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ
শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ	ফরিদপুর থেকে চট্টগ্রাম	১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দ
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ	সোনারগাঁ	১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দ
শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী	সোনারগাঁ	১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

শাহ সূফী শহীদ	সপ্তগ্রাম	১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পীর বদরুদ্দীন	হেমতাবাদ, দিনাজপুর	১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ
সাইয়্যিদ আব্বাস আলী মক্কী	সাতগাঁও	১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা	চট্টগ্রাম	১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ জালাল মুজাররাদ	সিলেট	১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ কামালউদ্দীন	শাহারপাড়া, সুনামগঞ্জ	১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দ
সাইয়্যিদ আহমদ কল্লা শহীদ	নোয়াখালী ও কুমিল্লা	১৩-১৪ শতক
শরীফ শাহ দরবেশ	সুন্দরবন	
বড়খান গাজী	যশোর, চব্বিশ পরগণা ও খুলনা	১৪ শতক
সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান	দিনাজপুর	চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে
মওলানা আতা	দিনাজপুর	১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দ
আখী সিরাজউদ্দীন	গৌড় ও পান্ডুয়া	১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ মালেক ইয়ামানী	ঢাকা	চতুর্দশ শতক
সাইয়্যিদ হাফেজ মাওলানা আহমদ তান্নুরী	সোনারবাগ, নোয়াখালী	১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ
শায়খ বখতিয়ার মাইসূর	সন্দ্বীপ	
রাসতি শাহ	কুমিল্লা	১৩৫১-১৩৮৮
সাইয়্যেদুল আরেফীন	পটুয়াখালী, বরিশাল	চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে
শাহ মুহসিন আউলিয়া	চট্টগ্রাম	১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

শায়খ আলাউদ্দিন আলাউল হক	পান্ডুয়া , সোনারগাঁ	১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ নূর কুতুবুল আলম	গৌড়	১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দ
শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী	দিনাজপুরের উত্তরাংশ	পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ
শাহ ইসমাঈল গাজী	রংপুর	১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ
খান জাহান আলী	যশোর, খুলনা	১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায় ৪ : প্রভাবশালী অলি-আউলিয়ার জীবন ও কর্ম :

এপর্যায়ে বাংলায় আগত পীর আউলিয়াদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের জীবন ও দাওয়াতি কাজের উপরে আলোকপাত করা হবে।

৪.১ হযরত শাহজালাল মুজাররাদ রহ (সিলেট)

উপমহাদেশে যে কয়জন প্রভাবশালী আউলিয়ার নাম জানা যায়, তাদের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইয়েমেন থেকে যাত্রা করেন এবং রাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সিলেট অঞ্চলকে মুসলিম শাসনের অধীনে আনেন।

ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচার, মানবিকতা, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বারা তিনি যে আলো ছড়িয়ে গেছেন, তা সিলেট ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলায় ও উপমহাদেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে শাহ জালাল মুজাররাদের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁর হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম

গ্রহণ করেছে। বস্তুত সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এতে সন্দেহ নেই। এ জেলাসমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব এ কথাই প্রমাণ করে।

আগমন : হযরত শাহ্ জালালের (রহ.) রওজায় প্রাপ্ত ফলক-লিপি সুহেলি ইয়ামনি অনুসারে, শাহ জালাল ৩২ বছর বয়সে ৭০৩ হিজরী মোতাবেক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ৩৬০ জন আউলিয়াকে সাথে নিয়ে সিলেটে প্রবেশ করেন।

জন্মবৃত্তান্ত :

তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.) উৎকীর্ণ দু'খানা শিলালিপি থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। সেখানে 'শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদ' নামে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে শায়খ শাহ জালালের পিতার নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর জন্মস্থানের নাম পাওয়া যায় না। ৯১১ হিজরী (১৫০৫ খৃ.) সনে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের আমলের তৃতীয় একটি শিলালিপিতে তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজ শিলালিপিটি আবিষ্কার করেন এবং হেনরী ব্লকম্যান কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। তাতে শাহ জালাল সম্পর্কে বলা হয়েছে: অর্থাৎ- "উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম আবেদ শাহ জালাল।

এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কুনিয়া তুরস্কের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল। গওস মান্দুবী তাঁর 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে শাহ জালাল সম্পর্কে যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাও এ বিবরণের সমর্থন করে। গওস মান্দুবী শায়খ আলী শেরের 'শারহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে শাহ জালাল সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। শায়খ আলী শের নিজেকে হযরত শাহ জালালের সাথী ও শিষ্য শায়খ নুরুল হুদা আবুল কেরামতের বংশধর বলে দাবি করেন। তিনি ১৫৬২ খৃস্টাব্দে বা তার কিছুকাল পরে ইন্তিকাল করেন। 'শারহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' ১৫৬২ খৃস্টাব্দে রচিত বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থটির কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। গওস মান্দুবী ১৬১৩ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত শাহ জালালের ইন্তিকালের পৌনে তিনশ বছর পর তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর বর্ণনা মতে, শাহ জালাল তুর্কীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সাইয়েদ আহমদ ইয়েসবীর খলীফা ছিলেন। এখানে আমরা শাহ জালালের

জন্মস্থানের যে পরিচয় পাই তা তৃতীয় শিলালিপির বর্ণনার সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। কারণ শিলালিপিতে উল্লিখিত কুনিয়া এশিয়া মাইনরে অবস্থিত। এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনস্থ থাকায় সম্ভবত গওস মান্দুবী একে তুর্কীস্তান মনে করেছেন। এ কথা মেনে নিলে হযরত শাহ জালালের জন্মস্থান সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধী মত গড়ে ওঠে।

'সুহাইল-ই-ইয়ামন' নামক হযরত শাহ জালাল সম্পর্কিত ফার্সী ভাষায় লিখিত অপর একটি জীবনী গ্রন্থে তাঁকে ইয়ামনের অধিবাসী বলা হয়েছে। এ গ্রন্থটি লেখেন ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে সিলেটের তদানীন্তন মুন্সেফ নাসীরুদ্দীন হায়দর। তিনি প্রচলিত আখ্যান এবং 'রিসালা' ও 'রওযাতুস সালাতীন' নামক দু'টি পুস্তিকার সাহায্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। রিসালা শাহ জালালের দরগাহের খাদিম মুহীউদ্দীন কর্তৃক রচিত। কিন্তু 'রওযাতুস সালাতীনে'র রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। 'রিসালা' ও 'রওযাতুস সালাতীন' পুস্তিকা দু'খানি যথাক্রমে ১৭১১ ও ১৭২১ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত শাহ জালালের অন্তত পৌনে চার'শ বছর পরের রচনা। ডক্টর এম. এ. রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে সুহাইল-ই-ইয়ামন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন:

"এ বইটি প্রধানত স্থানীয় জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর লেখক পূর্ববর্তী দু'খানা পুস্তিকার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, সেখান থেকেই তিনি এ বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঘটনা-বিবরণীর দিক দিয়ে কল্পনাভিত্তিক হলেও অন্যান্য সম-সাময়িক দলিল থেকে সুহাইলে ইয়ামনের কোন কোন ঘটনা-বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই একেবারে গালগল্প বলে বইটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সুহাইল-ই-ইয়ামনের বর্ণনা মতে শাহ জালাল ইয়ামনের মুহাম্মদ নামক জনৈক সূফীর পুত্র। বাল্যাবস্থায় তিনি পিতা-মাতাকে হারান। ফলে তাঁর মাতুল বিখ্যাত সূফী সাইয়েদ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি মামার সঙ্গে কাটান।

সুহাইল-ই-ইয়ামন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বা শিলালিপিতে হযরত শাহ জালালকে ইয়ামনের অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং শিলালিপিতে এবং 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে তাঁকে কুনয়ায়ী বা কুনিয়া শহরের (তুর্কীস্তানের) অধিবাসী বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিলালিপিতে ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামনে' তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ বলা হয়েছে। এ সব

বর্ণনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, শাহ জালাল প্রকৃতপক্ষে শায়খ জালাল নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে শায়খ 'শাহ' শব্দে রূপান্তরিত হয়। আর তাঁর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ এবং তিনি ছিলেন কুনিয়া শহরের অধিবাসী। অবশ্য এ ব্যাপারে আরো বিস্তৃত গবেষণার পরই হয়তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামনে'র বর্ণনামতে শাহ জালাল সারা তুর্কীস্তান ভ্রমণ করেন এবং ইয়ামন, বাগদাদ ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ শেষে দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। সেখানে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খৃ.) কাছে কিছুদিন অবস্থান করার পর বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন।

আগমনের কারণ ও রাজা গৌড় গোবিন্দের সাথে যুদ্ধ:

তিনি যখন বাংলায় প্রবেশ করেন তখন এখানে ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২ খৃ.) আমল। সম্ভবত তিনি তখন গৌড়ে অবস্থান করে গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সিলেট বিজয় সম্পর্কে 'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থদ্বয় সম্পূর্ণ একমত। এ উভয় গ্রন্থে এবং হিন্দু আখ্যানে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে তাঁর যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শাহ জালালের সিলেট আগমন সম্পর্কে সুহাইল-ই-ইয়ামনের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়। শায়খ বোরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু কোরবানী করেন। এ কথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো-হত্যার শাস্তিস্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তিপ্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনীত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। সিকান্দার খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করলে রাজা গৌর গোবিন্দের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সুলতান তাঁর ভাগিনেয়ের পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও-এর গভর্নর নাসিরুদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। হযরত শাহ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি

তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেনী নামক স্থানে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন।

এবারের যুদ্ধে রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। মুসলমানরা সিলেট জয় করে তাকে গৌড়ের অঙ্গীভূত করে। ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২ খৃ.) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয়বার্তা সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে:

"শায়খুল মাশায়েখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ্ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃ.)।"

এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম ৭৩০ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃ.) সিকান্দার খান গাজীর হাতে হযরত শাহ জালালের সহযোগিতায় সিলেট বিজিত হয় এবং তখন ছিল ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামল। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে দেখা যায়, রাজা গৌর গোবিন্দের কাছ থেকে সুলতান শামসুদ্দীন সিলেট জয় করেন। আবার সুহাইল-ই-ইয়ামনে বলা হয়েছে, সুলতান সিকান্দার তাঁর মাতুল গৌড়ের সুলতানের নির্দেশে সিলেট জয় করেন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিলালিপিতে উল্লিখিত ফিরোজ শাহ দেহলবী গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের (১২৬৫-৮৭ খৃ.) প্রপৌত্র। সম্ভবত দিল্লীর রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে তাঁকে 'দেহলবী' বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিলালিপিতে উল্লিখিত সিকান্দার খান গাজী ও সুহাইল-ই-ইয়ামনের সুলতান সিকান্দার অভিন্ন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নির্দেশে তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দার খান হযরত শাহ জালাল ও তাঁর ৩৬০ জন সহচর দরবেশ দলের সহযোগিতায় ১৩০৩ খৃস্টাব্দে সিলেট জয় করেন।

দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার :

সিলেট বিজিত হবার পর শাহ জালাল সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্যদলের একাংশ গৌড়ীয় সেনাদলের সাথে গৌড়ে ফিরে আসেন। তাঁরা বাংলার বিভিন্ন

স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অবশিষ্টাংশ তাঁর সঙ্গে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সিলেট, তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাসমূহ ও আসামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক অভিযান চালান। ফলে বাংলা ও আসামের অগণিত মানুষ তাঁর ও তাঁর সহচরদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনে বতুতার জবানে:

মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ অব্দে বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় তখন ছিল ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০ খৃ.) আমল। ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম (সাদকাওঁয়া) বন্দরে অবতরণ করে শাহ জালালের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নৌকাযোগে এক মাসের পথ অতিক্রম করে কামরূপে (কামারু) গমন করেন। তিনি শাহ জালালের আস্তানায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি বলেন, "শাহ জালাল লম্বা ও পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁর দু'দিকের গাল ছিল বসা, এক'শ পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলতেন, তিনি বাগদাদে খলীফা মু'তাসাম বিল্লাহকে দেখেছেন এবং খলীফাকে হত্যা করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা রাখেন। এ সময় দশদিন অন্তর তিনি ইফতারি করতেন।

ইবনে বতুতা লিখেছেন, "তিনি একটি গুহার মধ্যে অবস্থান করতেন। গুহার বাইরে ছিল তাঁর খানকাহ, লোকালয় থেকে দূরে। দেশের হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর দর্শনার্থে আসতো। তারা তাঁর জন্য তোহফা ও নজরানা আনতো। কিন্তু তিনি নিজে তা ভক্ষণ না করে তা থেকে ফকীর ও মিসকিনদের আহার্য যোগাতেন। তাঁর নিজের গাভী ছিল। সেই গাভীর দুধ পান করেই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন।"

ইবনে বতুতা তিন দিন পর্যন্ত হযরত শাহ জালালের মেহমানখানায় অবস্থান করেন। তিনি শাহ জালাল সম্পর্কিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি লিখেছেনঃ "তাঁর আস্তানা থেকে আমি যখন দু'মঞ্জিলের পথ দূরে ছিলাম তখন পথে শায়খের চারজন অনুচরের সাথে আমার দেখা হলো। তারা আমাকে জানালো: শায়খ অধিকাংশ ফকীরকে জানিয়েছিলেন যে, আরব দেশ থেকে একজন পর্যটক আমার নিকট আসছেন, তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে হবে। কাজেই শায়খের নির্দেশ মতো আমরা এসেছি। অথচ আমার আগমন সম্পর্কে শায়খ কিছুই অবগত ছিলেন না।

তাদের সাথে আমি শায়খের নিকট হাজির হলাম। আমাকে দেখেই শায়খ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার সাথে গলাগলি করে আমার দেশের ও পথের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব অবস্থা বললাম। তিনি বললেন: তুমি তো আরবের মুসাফির। তাঁর জনৈক সহচর বললেন: হুযুর, ইনি আরব ও আজম উভয় এলাকার মুসাফির। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আরব ও আজমের মুসাফির। কাজেই এঁর যথাযোগ্য সমাদর কর। "

" প্রথম দিন আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর পরনে মার্ভেতে প্রস্তুত একটি পশমী জোব্বা। আমি মনে মনে বললাম, শায়খ যদি জোব্বাটি আমাকে দিয়ে দিতেন তাহলে কতইনা ভালো হতো। শেষ দিন আমি যখন বিদায় নিতে গেলাম তখন শায়খ গুহার এক কোণে গিয়ে জোব্বাটি খুলে ফেললেন এবং তা এনে আমাকে পরিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের মাথা থেকে টুপিটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। পরে তাঁর অনুচররা আমাকে জানালো যে, শায়খ জোব্বা পরতে অভ্যস্ত নন, কেবলমাত্র আমার আসার খবর শুনে তিনি এ জোব্বাটি পরেন। তিনি বলেছিলেন, মগরিবের (মরক্কো) অধিবাসী আমার নিকট থেকে এ জোব্বাটি চাইবে। অতঃপর জনৈক কাফির বাদশাহ তার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে আমার ভাই বোরহানুদ্দীনকে দান করবে।"
অনুচরদের মুখে এ কথা শুনে আমি মনে দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম যে, শায়খ প্রদত্ত এ জোব্বাটি আমার জন্য একটি অতি মূল্যবান সম্পদ, কাজেই আমি এটি
পরিধান করে কোন মুসলমান বা কাফির বাদশাহর সামনে যাবো না। শায়েখের নিকট থেকে বিদায় নেয়ার দীর্ঘদিন পর আমি চীনের খানসা (হংচৌফু) শহরে গেলাম। শহরে নেমে আমি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভিড়ের চাপে এক স্থানে এসে আমি সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। এ সময় জোব্বাটি আমার পরিধানে ছিল। পথে জনৈক মন্ত্রীর সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং আমার হাত ধরে অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা বাদশাহ্ মহলের দরজায় পৌছে গেলাম। আমি বিদায় নিতে চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন না। আমাকে নিয়ে বাদশাহের নিকট হাজির হলেন। বাদশাহ আমার নিকট মুসলমান বাদশাহদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি জবাব দিলাম। আমার জোব্বার উপর বাদশাহর নজর পড়লো। তিনি জোব্বাটির অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। মন্ত্রী আমাকে জোব্বাটি খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন। সে সময় এ নির্দেশটি আমাকে পালন করতেই হলো। বাদশাহ জোব্বাটি নিয়ে নিলেন। এর বিনিময়ে তিনি আমাকে দশ জোড়া পোশাক ও সাজ সরঞ্জামসহ একটি ঘোড়া দিলেন এবং নগদ কিছু

অর্থও দিলেন। আমার ভীষণ দুঃখ হলো। শায়খের কথা মনে পড়লো। আমি যারপরনাই অবাকও হলাম। পরের বছর আমি গেলাম চীনের রাজধানী খান বালিক (পিকিং) শহরে। সেখানে শায়খ বোরহানুদ্দীন সাগেরজীর খানকায় যাবার সুযোগ হলো। দেখলাম শায়খ একটি কিতাব পড়ছেন। তাঁর পরিধানে সেই একই জোব্বাটি দেখলাম। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। জোব্বাটি হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। শায়খ আমাকে বললেন: তুমি এটি নাড়াচাড়া করছো কেন? তুমি কি এটা চেন? আমি বলমাম: হ্যাঁ চিনি, খানসার বাদশাহ এটি আমার নিকট থেকে নিয়েছিলেন। শায়খ বললেন: এ জোব্বাটি শায়খ জালালুদ্দীন আমার জন্য তৈরী করেছিলেন এবং আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে, উমুক ব্যক্তির মারফত জোব্বাটি আমার নিকট পৌঁছবে। শায়খ আমাকে পত্রটি দেখালেন। আমি পত্রটি পড়লাম এবং শায়খের নিশ্চিত সত্য ভাষণের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। পরে আমি শায়খ বোরহানুদ্দীনের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করলাম। সব শুনে তিনি বললেন: শায়খ শাহ জালালের মর্যাদা এর চাইতেও অনেক বেশি। তিনি বর্তমানে ইন্তিকাল করেছেন।

শায়খ বোরহানুদ্দীন শাহ জালালের আরো অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় সেগুলোও উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও শায়খ সম্পর্কিত আরো বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। কিন্তু এ সব অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু এ কথাই বলতে চাই যে, শায়খ শাহজালাল রহ: অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর এ সমুদয় শক্তি তিনি এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। খানকাহ থেকে তিনি একদিকে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন এবং অন্যদিকে এ কেন্দ্রটিকে গরীব-দুঃখীদের জন্য সাহায্য সংস্থা রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সহচরগণ বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত উত্তর বঙ্গে হযরত জালালুদ্দীন তাবরিজী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের ভূমিকাও ছিল একই পর্যায়ভুক্ত। বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সহচরদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রভাবশালী।

ইবনে বতুতা চীনে গিয়ে শায়খ বোরহানুদ্দীনের কাছে হযরত শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ১৫০ বছর পূর্ণ হয়েছিল। 'ইবনে বতুতা' ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করে ৪০ দিন পর আরাকান হয়ে জাভা ও সুমাত্রায় পৌঁছেন। সুমাত্রায় ১৫ দিন

অবস্থানের পর ২১ দিনের পথ অতিক্রম করে শ্যাম ও কম্বোডিয়ায় পৌঁছেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান শেষে চীনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৪০ দিনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তাঁদের জাহাজ চীনে প্রবেশ করে। ৭০ দিনে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণের পর তিনি চীনের কুন-চুন-ফু শহরে প্রবেশ করেন। এখানে ১৫ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর ১৭ দিনের সফর শেষে খানসা শহরে উপস্থিত হন। এখানে তাঁর জোব্বা ছিনিয়ে নেবার ঘটনা ঘটে। অতঃপর এখান থেকে বিভিন্নস্থান ভ্রমণ করতে করতে বেশ কিছুদিন পরে তিনি পিকিং শহরে পৌছেন এবং সেখানে বোরহানুদ্দীন সাগেরজীর কাছে শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পান। এভাবে দেখা যায়, শাহ জালালের মৃত্যু সংবাদ পেতে তাঁর এক বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কাজেই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করেন এবং ১৩৪৭ সালে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের ইন্তিকাল হয়। বাংলায় ইসলামের ঝান্ডাবাহী এই মহান সাধককে সিলেট শহরে শায়িত করা হয়েছে।

এই মহান সুফী ও দরবেশের দাওয়াতে অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর হাতে ঠিক কত সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে, তাঁর ধর্ম প্রচারের ফলে বহু মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার ও চারিত্রিক গুণাবলী দেখে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

সিলেট বিজয়ের পর দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ, শাহ জালালকে সিলেটের শাসনভার গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু শাহ জালাল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তিতে সুলতান বিশেষ ঘোষণা জারি করে সিলেট শহরের (কসবে সিলেট) খাজানা মুক্ত করে দরবেশকে সম্মানীত করেন যা এখনো (দরগাহর সংশ্লিষ্ট এলাকা) বলবত আছে।

তাঁর নিকটতম সহচর হাজী মুহাম্মদ ইউসুফকে দরগার খাদিম (অভিভাবক) নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ইউসুফের বংশধর, সারেকাউম পরিবার এখনও এই দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

অন্যান্য স্মারক:

দরগা চত্বরে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু জিনিস সংরক্ষিত আছে, যেমন - এক জোড়া খড়ম, একটি তরবারি এবং কয়েকটি থালাবাটি।

৪.২ : রাজশাহী ও হযরত শাহ মখদুম রুপোশ রহ: (১২১৬-১৩১৩ খ্রি)

শাহ মখদুম রুপোশ রহ: বাংলার প্রথিতযশা সুফী ও সাধক এবং ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশ তথা রাজশাহী অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বানী প্রচার করেছিলেন। তার অনুপম ব্যাক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শত শত মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মূলত শাহ মখদুমের মাধ্যমেই বরেন্দ্র এবং গৌড় (বর্তমান রাজশাহী) অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে এসব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। শাহ মখদুমের প্রকৃত নাম আব্দুল কুদ্দুস। ধর্ম এবং জ্ঞান সাধনায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে তার নামের সাথে "শাহ", "মখদুম", "রূপোশ" ইত্যাদি উপাধি যুক্ত হয়। তিনি শাহ মখদুম রূপোশ নামেই সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। মৃত্যুর পর তাকে তার বলে দেওয়া স্থানে সমাহিত করা হয়। তার কবর বর্তমান রাজশাহী শহরের দরগাপাড়ায় অবস্থিত, যার দক্ষিণে প্রমত্তা পদ্মা নদী এবং পূর্বে রাজশাহী কলেজ অবস্থিত। প্রতি বছর হিজরী সনের রজব মাসের ২৭ তারিখ এখানে ওরস পালন করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে শাহ মখদুমের হাজার হাজার ভক্ত অনুসারী সেদিন তার মাজার জিয়ারতে আসেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বহু পীর সাধকের পুণ্যভুমি রাজশাহী মহানগরী। যখন এই জনপদের মানুষ কুসংস্কার আর অপপ্রথার নিবিড় অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবে থেকে নানান কুকর্মে লিপ্ত ছিল, দেব-দেবীর নামে নরবলি দেয়া হতো, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল প্রকট, তখন থেকেই এ সকল পীর সাধকের আগমন ঘটতে থাকে সুদূর মধ্য প্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে। তারা অবোধ মানুষের মাঝে জ্ঞানের শিখা ছড়ানোর মহৎ উদ্দেশ্য ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিজ্ঞায় ও মনুষ্য সম্প্রদায়ের কল্যাণে জীবনের সব সময়টুকু ক্ষয় করে দেন।

তাদের ডিঙ্গাতে হয় নানা প্রতিকূলতার দেয়াল। এমনকি প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয় কাউকে কাউকে। এ সকল মহৎ প্রাণের অন্যতম পদ্মা পাড়ে চিরশায়িত হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ)।

কাজী রওশন আলী সম্পাদিত বিভাগ গাইড রাজশাহী গ্রন্থে ও হজরত শাহ মখদুম (রহঃ) দরগাহ পাবলিক ওয়াকফ এস্টেট ট্রাস্টি বোর্ড প্রকাশিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থে অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব একখানি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের কলমী পুথি। হজরত শাহ মখদুম (রহঃ) এর জীবনী তোয়ারিখ প্রবন্ধে হজরত শাহ মখদুম (রহঃ) এর প্রকৃত নাম হজরত সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রবীণ লেখক অধ্যাপক এবনে গোলাম সামাদ তার রাজশাহীর ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেন, "এই পীরের (হজরত শাহ মখদুম রহঃ) আসল নাম কি ছিল, তা নিয়েও আছে বিতর্ক। তিনি সাধারণভাবে রাজশাহী বাসীর কাছে বাবা মখদুম নামেই পরিচিত।" তিনি আরো উল্লেখ করেন, মখদুম শব্দটি আরবী। শব্দগত অর্থে শিক্ষক, জ্ঞানী অথবা পরিচালক। তবে তিনি আধ্যাত্মিক সাধক, জ্ঞানী, কামিলিয়াত ছিলেন এই বিষয়ে কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেনি। বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, হজরত শাহ মখদুম (রহঃ) ছিলেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর পৌত্র এবং আজাল্লা শাহ্ এর ২য় পুত্র। তিনি ৬১৫ হিজরীর ২ রজব বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। রুপোশ তার উপাধী। শব্দটি ফারসী। যার অর্থ মুখ আবরণকারী। তার উপাধি থেকে একথা বোঝা যায় যে, সাধারণ মানব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা লুকায়িত ছিল। হজরত শাহ মখদুম (রহঃ) এর রাজশাহী।

আগমনের অন্তরালে এক বিস্তৃত ইতিহাস :

১২৫৯ খ্রিষ্টব্দে মোঘল বীর হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করলে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর বংশধরগণ বাগদাদ থেকে কাবুল, কান্দাহার, পারস্য ও পাক ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। হযরত শাহ্ মখদুম রুপোশ (রহঃ) এর পিতা আজ্জালা শাহ্ দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার উন্নত চরিত্র ও গুণাবলীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ্ তার কাছে বায়েত হন। পিতার সহচার্যে তিন পুত্র সৈয়দ মুনির উদ্দীন আহমেদ (রহঃ), হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ), ও সৈয়দ আহমদ তন্বরী (রহঃ) অধ্যাত্মিক সাধনায় সমৃদ্ধ লাভ করেন। হালাকু খানের মৃত্যুর পর শাহ আজ্জালা বাগদাদে ফিরে গেলেও তার পুত্রগণ ইসলামের বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে

অনুচরবর্গসহ বাংলায় আগমন করেন। তখন রাজশাহীর নগরীর নাম ছিল মাহকাল গড়। এখানে মাহকাল দেও এর বিখ্যাত মন্দিরে নরবলি দেওয়া হতো। তার স্মৃতি এখনও হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) এর পবিত্র দরগা শরীফে রক্ষিত আছে। মহাকাল গড়ে সে সময় বহু রকম দেও এর প্রতিমূর্তি ও মঠ-মন্দিরে পূর্ণ ছিল। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) রাজশাহী আগমনের ১০ বছর পূর্বে হযরত তুরকান শাহ্ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দ মহাকাল গড়ে আগমন করেন। ঐ সময়ে রাজ্য শাসন করতেন অংশুদেও চান্তভন্ডী বর্মভোজ ও অংশুদেও খেজ্জুর চান্দ খড়গ বর্মগুজ্জুভোজ। মুসলিম বিদ্বেষী এই রাজাগণের দ্বারা তুরকান শাহ্ ও তার অনুচরগণ শহীদ হন। তার মাজরও দরগা পাড়ায় আছে। তুকান শাহ্ 'র আগমনের পূর্বেও কতিপয় মুসলমান ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাকাল গড়ে আগমন করেন এবং শহীদ হন। এসকল হত্যাকন্ডের প্রতিশোধ ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশ আগমন করে বাঘা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যে স্থানে কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন তা মখদুম নগর নামে খ্যাত। বাঘা ছিল তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ নগরী। এই নগরীর সাথে সুলতানগণের প্রশাসনিক যোগসূত্র ছিল। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্ র পুত্র নসরৎ শাহ্ ৯৩০ হিজরিতে বাঘা শরীফ পরিদর্শন করেন এবং একটি মসজিদ ও একটি পুকুর খনন করার নির্দেশ দেন। দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান মখদুম নগরীতে অবস্থিত মখদুম দরগাহ সংরক্ষণের জন্য ৪২টি মৌজা দান করেছিলেন। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) কর্তৃক মহাকালগড় দখল সম্পর্কে বেশ লোমহর্ষক ও রহস্যময় ঘটনা শোনা যায়। কথিত আছে মহাকাল গড়ের এক নাপিতের ৩টি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে দুটি নরবলি হওয়ার পর শেষ পুত্রটিও নরবলি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। একথা জানার পর নাপিত দম্পতি দুঃখে শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নিরুপায় হয়ে গোপনে মখদুম নগরে উপস্থিত হন। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) বিস্তর ঘটনা শোনার পর বলেন, যাও তোমার সন্তানসহ নদীর ধারে অপেক্ষা কর আমার সাক্ষাৎ পাবে।

এই নির্দেশ পাওয়ার পরে বেশ কদিন নাপিত দম্পতি নদীর তীরে অপেক্ষা করেও হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) সাক্ষাৎ না পেয়ে বলি হবার পূর্ব রাতে ডুবে মরার ইচ্ছায় পদ্মার পানিতে নামতেই হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) পদ্মায় কুমিরে চড়ে আবির্ভূত হন এবং নাপিত দম্পত্তির সাথে কিছু কথা বলেন এবং পুত্র বলি না হওয়ার ও দেওরাজ ধ্বংস হওয়ার আশ্বাস দিয়ে কুমিরে চড়েই অন্তর্ধান হন। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) এর জীবনী তোয়ারিখে উল্লেখ আছে, মহাকালগড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাচীর বেষ্টিত যাদুকুন্ড কূপ

ছিল। দেও রাজাদ্বয় তা দ্বারা যাদুবিদ্যা পরিচালনা করে অসম্ভব অলৌকিক কার্য সফল করে নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে দাবি করত। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) ঐ নাপিতের কাছে সন্ধান নিয়ে যাবার কালে ঐ স্থান পরিদর্শন করে ঐসব যাদুগুণ নষ্ট করে যান। পরে ঐ যাদু স্থান উৎঘাটন করা হয়। তার তলদেশ হতে বিভিন্ন দেও পুতুল, নানা প্রকার জিনিস, অস্থী এবং ১টি জলীয় বৃক্ষ বের হয়েছিল। বর্তমানে ঐ স্থান পুকুর রুপে রয়েছে।

রাত অবসানের পর সকালে নাপিত পুত্রকে বলি দেবার জন্য দেও মন্দিরে আনা হলো। কিন্তু খাড়ার ঘাতে নাপিত পুত্র বলি হওয়া তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র কষ্টও অনুভব করল না। বরং মহাকাল প্রতিমা পড়ে যাবার মত লেতে শুরু করল। দেওরাজের নিকট এ সংবাদ পৌছালে সে ছুটে এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এই নরে দোষ আছে বলে নাপিত পুত্রকে ছেড়ে দেয়। এর কয়েক দিন পর হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) দেওরাজ্যের বিরুদ্ধে মহাকালগড় জয়ের উদ্দেশ্যে মওলাং ফকির, দরবেশ, গাজি দল পাঠিয়েছিলেন। পর পর তিনবার যুদ্ধ করার পর হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) মহাকালগড়ে নরবলি প্রথার পরিবর্তে ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়েছিলেন।

দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ :

প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বর্তমান ঘোড়ামারায়। এই যুদ্ধে দেও ধর্মাবলম্বীসহ অনেক ফকিরগণও মারা পড়েছিলেন এবং তাদের ঘোড়াও শহীদ হয়েছিত। ঘোড়া শহীদের কারনেই স্থানটির নামকরণ হয় ঘোড়ামারা। দ্বিতীয় যুদ্ধে হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) সাহেব মওলাং ফকির দরবেশকে গাজী প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং বহু মওলাং ফকির সঙ্গে করে মহাকালগড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যুদ্ধে বহু দৈত্য ধর্মাবলম্বী ধরাশায়ী হয়েছিল।

অনেক মঠ-মন্দির ভেঙ্গে চুরমার ও লুণ্ঠিত হয়েছিল। দৈত্যরাজ স্বপরিজনে পালিয়েছিল এবং হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) বিজয়ী হয়ে মখদুম নগরে প্রত্যাগমন করেছিলেন। এরপর বনবাসী দৈত্যরাজের দৈত্য ধর্মাবলম্বীরা পুনরায় সমবেত হয়ে তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য মাহাকালগড়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) পুনরায় মহাকালগড়ে আগমন করে সমবেত প্রতিপক্ষ দলকে পাক পায়ের মাত্র ১ পাট খড়ম ছুড়ে ধরাশায়ী করেছিলেন। অবশেষে পরিজনসহ দেওরাজ তার পায়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করেছিল ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ)

মহাকাল দেও মন্দিরেই আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। পানি পথে তার ছিল কুমীর বাহন, শুন্য পথে বসিবার পীড়ি আসন বাহন, শুস্ক পথে সিংহ ও বাঘ্র বাহন। তার অলৌকিক ঘটনা, বোজর্গী কেরামত দেখে অনেকে ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিল। অনেকে সভ্য হিন্দু সমাজে নীত হয়েছিল ও অনেকে তাকে বড় যাদুগরী বলে প্রচার করেছিলন।

ইসলাম প্রচার :

হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) বাংলায় দেওজাতিকে ইসলামের সুমহান আদর্শে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী বা সেকালের মহাকালগড়ে আগমন করে সফল নেতৃত্ব দান করে ১৩৩১ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যর পরও দরগা শরীফকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। তার শিষ্য ও অনুসারীগণের মধ্যে অন্যতম হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন- হযরত শাহ্ আব্বাস (রহঃ) (মখদুম নগরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তার মাজার বিলীন হয়ে গেছে), শাহ্ রকম আলী (রহঃ) (পুঠিয়া-বিড়ালদহ), হযরত দিলাল বোখারী (রহঃ) (আলাইপুর, বাঘা), হযরত শাহ্ সুলতান (রহঃ) (সুতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী)

রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মখদুম রূপোশের দান অতুলনীয়। এ অঞ্চলে আগমনকারী ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়। রাজশাহীর দরগাহ পাড়া নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর মাযার অবস্থিত। মাযারগাত্রে খোদিত নামফলকে তাঁকে 'সাইয়েদে সনদ শাহ দরবেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এগুলোর কোনটিই তাঁর নাম নয়, উপাধি বিশেষ। মোগল বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে (১৫৩০-১৫৫৬ খৃ.) মাজার সন্নিহিত এলাকাকে ওয়াক্ত সম্পত্তি হিসেবে দান করা হয়। তারও অনেক পরে ইরানের শাহ আব্বাস সফবীর (১৫৮৭-১৬২৯ খৃ.) শাগরিদ আলী কুলী বেগ ১০৪৫ হিজরীতে (১৬৩৪ খৃ.) এ মাযারটি নির্মাণ করেন। ১৯০৪ সালে মাযারের তদানীন্তন খাদেম জনাব গোলাম আকবর রাজশাহী জেলা কোর্টে দরগাহ সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কিত যে বিবৃতি দেন তা থেকে হযরত শাহ মখদুমের বাংলায় আগমন কাল চিহ্নিত করা যেতে পারে। ডঃ এনামুল হক তাঁর 'সূফীইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় এ বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেছেন। বিবৃতিটি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

"মখদুম সাহেবের নাম হযরত শাহ রূপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল তা আমি জানি না। তাঁর ইন্তিকালের তারিখও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর

পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছি তাতে আমি এ উল্লেখ করেছি যে, হযরত রূপোশ ঐ সময়ের ৪৫০ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন।"

অবশ্যই রূপোশও কোন নাম বা নামের অংশ হতে পারে না। এটিও উপাধি বিশেষ। রূপোশ ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ। অর্থাৎ যিনি কোনো নেকাব বা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। কাজেই এ সাক্ষ্য থেকেও হযরত শাহ মখদুম রূপোশের আসল নাম জানা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিতর্ক এসে যাচ্ছে। তাই সেটার সুরাহা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ খাদেম সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃ.) পূর্বে সম্পত্তিটি প্রদত্ত হয়নি। অথচ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে (১৫৩০-১৫৫৬ খৃ.) সম্পত্তিটি প্রদত্ত হয়। তাহলে ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ূনের উপস্থিতি কেমন করে সম্ভব? এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, হুমায়ূনের আমলে সম্পত্তিটি দান

করা হয় ঠিকই, তবে যথাযথভাবে তা কাগজে-কলমে কার্যকর রূপ নেয় ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে। এখানে খাদেম সাহেবের কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃ.) ৪৫০ বছর পূর্বে শাহ মখদুম রূপোশ জীবিত ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় যে, হযরত শাহ মখদুম রূপোশ ১১৮৪ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এ দেশে ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ্ মখদুম রূপোশকে তাঁদের অন্যতম বলা যেতে পারে। সম্ভবত এ জন্যই তাঁকে রাজশাহী অঞ্চলের সূফী ও ইসলাম প্রচারকদের প্রধান বা ওস্তাদ বলা হয়।

আধুনিক রাজশাহী শহরটি মূলত রামপুর ও বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পদ্মার উত্তর পাড়ে অবস্থিত এ রামপুর গ্রামে ছিল কিছু সংখ্যক জেলের বাস। একদিন কয়েকজন জেলে নদীতে মাছ ধরছিল, এমন সময় তারা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারা দেখলো, লম্বা আলখেল্লা পরা এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি, পায়ে খড়ম ও হাতে একটি লাঠি। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসছেন। এ দৃশ্য দেখে জেলেরা তাদের সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে দ্রুত তাঁর কাছে পৌছে গেলো। ততক্ষণে তিনি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। জেলেরা তাঁর কাছে আশীর্বাদ-প্রার্থী হলো। তিনি জেলেদের কাছে কিছু আহার চাইলেন। তারা তাড়াতাড়ি

নিজেদের সাধ্যমতো মাটির পাত্রে করে কিছু খাদ্য আনলো। তিনি খাদ্যের পাত্রগুলো নিজের পাগড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর হাত তুলে দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ পর পাগড়িটি সরিয়ে নিলেন। দেখা গেলো খাদ্যগুলো মাছে ও পাত্রগুলো সোনায় পরিণত হয়ে গেছে।

দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জেলেরা মুগ্ধ হলো এবং ধীরে ধীরে তারা তাঁর ভক্ত-শ্রেণীতে পরিণত হলো। অতঃপর এখান থেকে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়ে তিনি নিজের আস্তানা গাড়লেন। এ স্থানটিই বর্তমানে দরগাহ পাড়া নামে পরিচিত। এখানে জেলেদের মধ্যে বসে তিনি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন।

হযরত শাহ মখদুম রূপোশ সম্পর্কিত এ কিংবদন্তিটি রাজশাহী অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এ কিংবদন্তি থেকে আমরা যে আসল বিষয়টি জানতে পারি তা হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বে এ অঞ্চলে আর কোনো ইসলাম প্রচারক আসেননি। তিনি নিজের চরিত্র মাধুর্য, ব্যবহার ও আত্মিক শক্তি বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করেন। শোনা যায়, তাঁর আত্মিক ক্ষমতার কথা শুনে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে এসেছে এবং যে ব্যক্তি কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে থেকেছে সে-ই ইসলামের আলোকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ধন্য হয়েছে। নতুন মুসলমানরা তাঁকে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের পুরাতন আবাসে ফিরে যাবার চেয়ে তাঁর আস্তানার আশেপাশে নিজেদের আবাস গড়ে তুলতে থাকে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের পর অমুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে অমুসলিম সমাজের বিরোধিতা এড়াবার জন্য তারা একস্থানে নিজেদের শক্তি জোট গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এভাবে রামপুর গ্রামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী বোয়ালিয়া গ্রামেও নতুন মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠতে থাকে।

পরবর্তীকালে এ এলাকাটিই রাজশাহী নাম ধারণ করে। হয়রত শাহ্ মখদুম রূপোশ এখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। প্রতি বছর ২৭ রজব তাঁর মাযারে উরস অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৩ : নুর কুতুবুল আলম (চট্টগ্রাম)

নূর কুতুবুল আলম একজন দরবেশ এবং রাজা গণেশের এর নিপীড়ন থেকে বাংলার মুসলমান জনগণকে রক্ষাকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি শেখ আলাউল হকের পুত্র ও প্রধান শিষ্য এবং লাহোরের শেখ আসাদের পৌত্র। তিনি পান্ডুয়ার পীর আউলিয়াদের মধ্যে শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী হন। পিতা-পুত্র দুজনই পান্ডুয়ার বিখ্যাত শাশ হাজারী দরগায় (যে দরগায় ছয় হাজার টাকার সম্পত্তি দান করা আছে) শায়িত আছেন। পিতার ন্যায় তিনি চিশতিয়া মতাদর্শের পীর ছিলেন। তাঁর অনুসারী শিষ্যকুল ও দরবেশগণ কয়েক শতক ধরে বাংলায় মুসলিম সমাজজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শেখ আলাউল হক সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তদীয় পুত্র সিকান্দর শাহ এর সমসাময়িক ছিলেন, আর নূর কুতুব আলম ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ এর সতীর্থ ও সমসাময়িক।
বাংলার মুসলিম রাজ্যকে এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করার জন্য শেখ নূর কুতুবুল আলম তাঁর পিতার চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যখন রাজা গণেশ পান্ডুয়ায় ক্ষমতা দখল করে শেখ, উলেমাসহ মুসলমান জনগণের উপর নির্বিচারে অত্যাচার শুরু করেন, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কিকে বাংলার মুসলমানদের সহায়তায় এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। ইবরাহিম শর্কিকে অনুরূপ আহবান জানানোর জন্য তিনি মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানিকেও অপর একটি পত্রে অনুরোধ জানান। উভয়ের আহবানে সাড়া দিয়ে সুলতান ইবরাহিম বিরাট বাহিনী নিয়ে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। এতে গণেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শেখ নূরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং দরবেশের নিকট প্রার্থনা করেন যাতে তিনি সুলতান ইবরাহিমকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। নূর কুতুব আলম এতে সম্মত হন নি, বরং পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি রাজা গণেশকে মুসলমান হতে আদেশ দেন, কেননা কোন অমুসলমানের পক্ষ নিয়ে একজন মুসলিম নৃপতিকে অনুরোধ জানাতে তিনি অপারগ বলে জানান। গণেশ তাতে সম্মত হন কিন্তু বিস্তারিত শুনে তাঁর রানী এতে বাধা দেন। গণেশ তখন তাঁর ১২ বছরের ছেলে যদুকে নিয়ে শেখের নিকট আসেন। যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে জালালুদ্দীন নাম দেওয়া হয় এবং গণেশ তাঁর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। শেখের মৃত্যুর পর গণেশ অবশ্য যদুকে হিন্দু ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করে নিজে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু শীঘ্রই গণেশের মৃত্যু হলে যদু জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিনয় আয়ত্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নূর কুতুব আলম তাঁর পিতার আমল থেকে সব ধরনের কায়িক শ্রম অভ্যাস করতেন। দরগায় আগত ফকিরদের কাপড় ধোয়া, লাকড়ি ও পানি বহন, শীতকালে মুরশীদের অজু করার জন্য সর্বদা পানি গরম রাখা, এমন কি খানকাহ সংলগ্ন শৌচাগার পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি তাঁর দুই পুত্র শেখ রাফকাতউদ্দীন এবং শেখ আনোয়ারকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেন। পূর্বোক্ত জনের ছেলে শেখ জাহিদ পিতামহের মৃত্যুর পর দরবেশ হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। খুব সম্ভবত পিতার জীবদ্দশায় শেখ আনোয়ার রাজা গণেশের হাতে সোনারগাঁওয়ে শহীদ হন। শেখ নূর কুতুব আলমের অন্য আর একজন প্রধান মুরিদ ছিলেন শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী।

শেখ নূর কুতুব আলমের দরগাহ সংলগ্ন সরাইখানা ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অনেক গ্রাম দান করেন। দরবেশের মাযার জিয়ারতের জন্য সুলতান বছরে একবার রাজধানী শহর একডালা হতে পান্ডুয়ায় আসতেন। শেখ নূর কুতুব আলমের মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব তারিখটি হবে ৮১৮ হিজরি বা ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ এবং এ তারিখের অভিব্যক্তি হলো নূর বানূর-শুদ (আলো আলোতে বিলীন)। [আবদুল করিম]

ধর্মীয় নেতৃত্ব :

বাংলাদেশের ইতিহাসের একজন অনন্য সাধারণ পুরুষ ছিলেন হযরত শাহ নূর কুবুল আলম। তিনি কেবল তদানীন্তন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও সূফী ছিলেন না বরং একই সঙ্গে তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা। তাঁর আমলেই মুসলিম বাংলা বৃহত্তম রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। একজন মর্দে মুজাহিদের ন্যায় তিনি এ সংকটের মুকাবিলা করেন এবং যথাসময়ে মুসলিম জাতির সঠিক নেতৃত্ব দান করে ইসলামের অগ্রগতির পথে প্রকাণ্ড বাধা দূর করেন। এ জন্য তাঁকে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বস্তুত প্রায় দেড়শ বছর ধরে তাঁর পরিবার বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব দান করে এ দেশে ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ সুগম করে।

সুলতানের বন্ধু:

শাহ নূর কুতুবুল আলম ছিলেন গৌড়ের ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (রাজত্বকাল: ১৩৯৮-১৪১০ খৃ.) সহপাঠী ও বন্ধু। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিবর্তিত ছিল। সুলতান তাঁর মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিভিন্ন পরামর্শ মেনে

চলতেন। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা মতে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোধপুরের কাযী হামিদুদ্দীন কুঞ্জনশীন নাগোরী (১২৫৬-১৩৬০ খৃ.) ছিলেন তাঁর উস্তাদ। উস্তাদ হামিদুদ্দীন নাগোরীর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরও পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর পরবর্তী জীবন গড়ে ওঠে।

কৃচ্ছ্রসাধন :

পুত্রকে যথাযথভাবে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য পিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ জন্য ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে দূরে তাঁকে কৃচ্ছ্রসাধনার জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। পিতা পরিচালিত খানকাহ-সংশ্লিষ্ট লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। ফকীর, ভিখারী, মুসাফিরগণের কাপড় ধোয়া, তাদের ওযু-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকার মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তৎসংলগ্ন পায়খানা সাফ করা
ভিখারী, মুসাফিরগণের কাপড় ধোয়া, তাদের ওযু-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকার মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তৎসংলগ্ন পায়খানা সাফ করা প্রভৃতি কাজ তাঁকে নিজের হাতে করতে হতো। দূরবর্তী বন থেকে লঙ্গরখানার জন্য প্রতিদিন জ্বালানি কাঠও তাঁকে সংগ্রহ করে আনতে হতো। কথিত আছে, একদিন এভাবে জ্বালানি কাঠ বহন করে আনার সময় পথে তাঁর ভাই আযম খাঁর সাথে দেখা হয়। তাঁর এ ভাই আযম খাঁ গৌড়ের সুলতানের অধীনে একজন মন্ত্রী ছিলেন। কুতবুল আলমের কষ্ট দেখে ভাই আযম খাঁ তাঁকে এহেন মজুরের কাজ ত্যাগ করে তাঁর অধীনে কোনো সম্মানজনক চাকরি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার লোভনীয় প্রস্তাব তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বীন প্রচার:

এভাবে সেবা, নির্লোভ জীবন যাপন ও আল্লাহর প্রতি একান্ত আনুগত্যের মাধ্যমে তিনি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্ম সাধনার খ্যাতি বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী জ্ঞান-পিপাসুরা পান্ডুয়ায় সমবেত হতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর মাদ্রাসা ও খানকাহ বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান অনুশীলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সোনারগাঁওয়ের হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্রাসার ন্যায় পাণ্ডুয়ার হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের এ মাদ্রাসাটিও তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। মানিকপুরের শায়খ হুসামুদ্দীন, লাহোরের শায়খ কাকু, আজমীরের শায়খ শামসুদ্দীন, তাঁর দুই ছেলে শায়খ

বরকতউদ্দীন ও শায়খ আনওয়ার এবং পৌত্র শায়খ জাহিদ পান্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর এ শিক্ষায়তনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অধীনে একটি মাদ্রাসা, একটি খানকাহ, একটি লঙ্গরখানা ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে এ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য সুলতান হোসেন শাহ অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইতিপূর্বে বলেছি, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ছিল এবং রাজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে সুলতান তাঁর পরামর্শও নিতেন। এভাবে প্রকারান্তরে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ আত্মিক উৎকর্ষ ও নিঃস্বার্থ জনসেবামূলক কার্যক্রমের কারণে মুসলিম জনতা তাঁকে নিজেদের যথার্থ পরিচালক ও নেতা মনে করতো। কাজেই সামাজিক ও জাতীয় সংকট মুহূর্তে জনগণ তাঁর কাছ থেকেই যথার্থ নেতৃত্বের আশা করতো। তাই সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যুর মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বৃহত্তম সংকট দেখা দিল তার সমাধানে তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে এলেন এবং একজন মর্দে মুজাহিদের ন্যায় এ সংকটের মোকাবিলা করে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানের জীবন ও সম্ভাবনাকে রাহু মুক্ত করলেন।

রাজা গণেশের চক্রান্ত :

ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আমলে কতিপয় হিন্দু সভাসদকে বড় বড় রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। মুজাফ্ফর শামস বল্খী ও শাহ নূর কুতুবুল আলম এ ব্যাপারে যথাসময়ে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ এ নীতি অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনামলের শেষের দিক থেকেই হিন্দু অমাত্যরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে ওঠে। গিয়াসুদ্দীন স্বয়ং এ চক্রান্তের শিকার হন। গিয়াসুদ্দীনের অমাত্য ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বা কংস নারায়ণ ছিলেন এ চক্রান্তের মূল পরিকল্পক ও পরিচালক। কাজেই গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর পরবর্তী তিনজন ইলিয়াস শাহী সুলতান মূলত গণেশের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ফলে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মৃত্যুর মাত্র চার বছর পর আমরা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে রাজা কংস বা গণেশ নামে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিককালের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ তাঁকে দনুজ মর্দন দেব নামেও চিহ্নিত করেছেন। সম্ভবত সিংহাসন লাভের পর তিনি দনুজ মর্দন দেব (দৈত্য দলনকারী) নাম গ্রহণ করেন।

১৪১৪ খৃস্টাব্দে রাজা গণেশ এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলে

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। প্রায় দু' শতাব্দীকাল থেকে রাজ্যহারা বর্ণ হিন্দুদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ রাজা গণেশের শাসন দণ্ডের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শাহ নূর কুবুল আলম ও আশরাফ সিমনানীর পত্রাবলী এবং গোলাম হোসাইন সলীম রচিত রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থ থেকে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারা যায়।

রাজা গণেশের অত্যাচার :

রাজা গণেশ মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাকে সালাম না করার কারণে শায়খ বদরুল ইসলামকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং অন্যান্য বহু আলেমকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। রাজা গণেশের অত্যাচারে ধৈর্যহারা হয়ে হযরত নূর কুবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলা রাজ্য আক্রমণ করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। নূর কুতবুল আলমের পত্র পেয়ে ইবরাহীম শর্কী দ্রুতগতিতে সৈন্য পরিচালনা করে ফিরোজপুর (পুরাতন মালদহ) এসে শিবির স্থাপন করেন।

এদিকে ইবরাহীম শর্কীর সেনাবাহিনী গৌড়ের অদূরে পৌছে গেছে শুনে রাজা গণেশ বিপদ গণলেন। নিরূপায় হয়ে তিনি হযরত নূর কুতবুল আলমের সম্মুখে গিয়ে এ বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। নূর কুবুল আলম তাঁকে জানালেন, "একজন অত্যাচারী পৌত্তলিকের জন্য আমি একজন মুসলমান সুলতানের কাছে অনুরোধ করতে পারবো না-বিশেষ করে যিনি আমার ইচ্ছা ও অনুরোধে এসেছেন।" নিরাশ হয়ে রাজা অবশেষে নিজের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু রাজার স্ত্রী তাতে বাদ সাধলেন। তিনি এ বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখলেন। অবশেষে রাজা গণেশ তাঁর বার বছরের ছেলে যদুকে (নামান্তরে জিজ্জ্বল) ইসলামে দীক্ষিত করে সিংহসানে অধিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিলেন। হযরত নূর কুতবুল আলম রাজা গণেশের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নিজের মুখ থেকে চিবানো সুপারি বের করে যদুর মুখে দিলেন, অতঃপর তাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করলেন এবং তার নাম রাখলেন জালালুদ্দীন। এ সংবাদ সর্বত্র প্রচার করে তার নামে খুত্বা পাঠের নির্দেশ দিলেন। সেদিন থেকে বাংলায় আবার মুসলমানী আইন জারি হলো। হযরত নূর কুবুল আলমের অনুরোধে অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে সুলতান ইবরাহীম শর্কী সসৈন্য জৌনপুরে ফিরে গেলেন।

গণেশের ছেলের ইসলাম গ্রহণ :

সুলতান ইবরাহীম শর্কীর বাংলা ত্যাগ করার পর রাজা গণেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। জালালুদ্দীনকে সরিয়ে নিজেই সিংহাসনে বসলেন এবং সুবর্ণধেনু ব্রতের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে পুনর্বার হিন্দু করলেন। অর্থাৎ সোনার গরু তৈরী করে জালালুদ্দীনকে গরুর মুখের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়ে টেনে বের করা হলো এবং গরুর মূর্তি ভেঙে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। কিন্তু জালালুদ্দীন যেহেতু শাহ নূর কুতবুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাই তিনি ইসলামের উপর নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করেননি এবং পুনর্বার হিন্দুত্বে প্রবেশের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

অতঃপর রাজা গণেশ পূর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগলেন। এমনকি তিনি নূর কুবুল আলমের পরিবারের লোকজন, তাঁর চাকর-বাকর ও প্রতিপালিত ব্যক্তিদের উপরও নির্যাতন শুরু করলেন। কুবুল আলমের পুত্র শায়খ আনওয়ার ও তাঁর পৌত্র শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত করলেন। সেখানে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হলো। কথিত আছে, "যেদিন এবং ঠিক যে মুহূর্তে সোনারগাঁও-এর মাটি আনওয়ারের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয় ঠিক সেদিন রাজা গণেশের মৃত্যু হয়।”

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর হযরত নূর কুতবুল আলমের প্রচেষ্টায় যদুকে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ যে ইসলামের একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর আমলে এ দেশে ইসলাম যে অধিকতর বিস্তৃত হয়েছিল ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। জালালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণের পর শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং সুবর্ণধেনু ব্রতে অংশগ্রহণকারী ব্রাহ্মণদেরকে শাস্তি দেন।

মৃত্যু :

রাজা গণেশের মৃত্যুর পরও নূর কুতবুল আলম বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তাজকিরার বর্ণনা মতে তিনি ১৪৪৭খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। 'আইন-ই-আকবরী'র মতে ১৪০৫ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আইনের মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ ১৪০৫ খৃস্টাব্দের বহু পরে রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেন। 'মিরআতুল আসরার' নামক ফার্সী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ৮১৮ হিজরীর (১৪১৫ খৃ.) ৯ যিলকদ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্লকম্যান মৃত্যুর তারিখ নির্দেশক একখানা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শব্দাবলীর সাংখ্যিক মান ৮৫১ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই ৮৫১

হিজরীকে (১৪৪৭ খৃ.) তাঁর মৃত্যু সন ধরলে তাজকিরার বর্ণনাই সঠিক প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ তিনি ১৪৪৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ও তাঁর পুত্র আহমদ শাহ উভয়ই হযরত শাহ নূর কুতবুল আলমের শাগরিদ ছিলেন, এ কথা বিবেচনা করলে ১৪৪৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-তারিখ হিসাবে মেনে নেয়াই সঙ্গত মনে হয়।

তাঁর শাগরিদ ও ছাত্রবৃন্দ বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। তাঁর দুই পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন ও শায়খ আনওয়ার শহীদ এবং এক পৌত্র শায়খ জাহিদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

৪.৪ : শাহ সুলতান বলখী রহ: মাহিসওয়ার (বগুড়া)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে সকল আধ্যাত্মিক দরবেশ যোদ্ধা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার । একাদশ শতাব্দিতে আফগানিস্তান থেকে আগত এ মুসলিম ধর্ম প্রচারক প্রথমে সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচার করেন এবং পরে পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান বগুড়া জেলা) অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেন।

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ে রয়েছে তার মাজার। এ স্থানটি আজ পুন্যার্থীদের জন্য এক তীর্থস্থান। ১৬৮৫ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বলখীর দরগা খাজনা মুক্ত ঘোষণা করা হয় এবং মাজারে বুড়ি কা দরজা নামে প্রবেশদ্বার।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আফগানিস্তানের বালখ রাজ্যের সম্রাট শাহ আলী আসগরের পুত্র ছিলেন শাহ সুলতান। পিতার মৃত্যুর পর তাকেই সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তিনি তার সাম্রাজ্য ছেড়ে দামেস্ক শহরে এক আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ কামেল

পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে প্রায় একযুগ (১২ বছর ভিন্ন মতে ৩৬ বছর) আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। কথিত আছে শাহ সুলতান তার শীষ্যদের নিয়ে ফকিরবেশে একটি মাছ আকৃতির নৌকাতে করে মহাস্থানগড় এসেছিলেন সেখান থেকে তার নামের সাথে যুক্ত হয়েছে মাহিসাওয়ার (মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে আগমনকারী)।

বলখ থেকে এসেছিলেন সেজন্য তাকে শাহ সুলতান বলখীও বলা হয়।

দাওয়াতি কাজ:

পীর শেখ তৌফিক শাহ সুলতানকে বাংলায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ দেন। তিনি সমুদ্রপথে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত সন্দ্বীপে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি হরিরামনগরে আসেন। জায়গাটি সম্ভবত সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল এবং কালী উপাসক বলরাম তখন স্থানটি শাসন করছিলেন। রাজা শাহ সুলতানকে ইসলাম প্রচারে বাধা দেন। সংঘর্ষে রাজা মারা যান এবং তাঁর মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচান। অতঃপর শাহ সুলতান মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন। স্থানীয় রাজা পরশুরাম ও তাঁর বোন শিলাদেবী শাহ সুলতানকে বাধা দেন। ফলে দুপক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং শিলাদেবী করতোয়া নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেন। জায়গাটি এখনো শিলাদেবীর ঘাট হিসেবে পরিচিত।

শাহ সুলতানের আগমন এবং রাজা বলরাম ও পরশুরামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী শুধু জনশ্রুতির মাধ্যমে জানা যায়। তিনি মাহিসওয়ার (মাছের পিঠে আরোহী) নামে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত তিনি মাছ আকৃতির নৌকায় এসেছিলেন বলে সাধারণ লোকের নিকট মাহিসওয়ার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জনগণ তাঁকে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন মহান দরবেশ বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে আসছে।

১০৯৬ হিজরিতে (১৬৮৫ খ্রি) আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সৈয়দ মুহম্মদ তাহির, সৈয়দ আব্দুর রহমান এবং সৈয়দ মুহম্মদ রেজা নামক তিন ব্যক্তির নামে এক সনদ জারি করা হয়। এই সনদ বলে তাঁরা স্থায়িভাবে দরগাহ সংলগ্ন লাখেরাজ ভূমি (রাজস্ব-মুক্ত জমি) ভোগ-দখলের অধিকার পান। সনদে কুকুলতাশ মুজাফ্ফর জঙের সিলমোহর অঙ্কিত আছে এবং এটি সরকার বাজুহার অন্তর্গত সিলবারী পরগনার মুৎসদ্দি, চৌধুরী, কানুনগো প্রভৃতি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট নির্দেশ হিসেবে পাঠান হয়। দলিলের মালিকরা যাতে দরবেশের লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কর্ম-কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সনদে পূর্ববর্তী শাসকদের প্রদত্ত অনুরূপ সনদ ওফরমানের উল্লেখ আছে। অতএব দরগাহটি বেশ পুরানো, তবে কত পুরানো তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না, কারণ পূর্ববর্তী সনদ ও ফরমান পাওয়া যায় নি। স্থানীয় লোকজন

শাহসুলতান মাহিসওয়ারকে খুব শ্রদ্ধা করে। প্রতিদিন বহু লোক শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর দরগাহ দর্শনে আসে। [আবদুল করিম]

৪:৫ বাবা আদম শহীদ (রহঃ) (মুন্সিগঞ্জ)

১০৯৯ সালে বাবা আদম (রহঃ) সৌদি আরবের মক্কা নগর থেকে কিছুটা দূরের শহর তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ লক্ষ্যে তিনি বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর কাছে দীক্ষা নিতে বর্তমান ইরাকের বাগদাদে চলে আসেন। এরপর তিনি আরব থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আসেন।
তখন বাংলায় সেন শাসন আমল চলছিল। সেরকম সময়ে ১১৭৮ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ধলেশ্বরীর তীরে মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমে আসেন আধ্যাত্মিক সাধক বাবা আদম। তখন এ এলাকাটি ছিল বল্লাল সেনের অধীনে।

তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস ও ইসলামী জ্ঞান বিশারদ হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ সোনারগাঁওয়ে আগমন করে এ স্থানে ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন। অথচ বাবা আদম শহীদের আগমনের পূর্বে এ এলাকায় ও এর আশেপাশে ইসলামী জ্ঞানের কোনো চর্চাই ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ সময় থেকে বহু পূর্বেই বাবা আদম শহীদের আগমন হয়েছিল। তবে কি লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেনের সাথে বাবা আদমের যুদ্ধ হয়েছিল? লক্ষণ সেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিক্রমপুরে এসে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর তাঁর বংশধরগণ অন্তত ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ অবধি বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল গ্রামে বায়াদুম নামক জনৈক ম্লেচ্ছের সাথে রাজা বল্লালের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বায়াদুম যে বাবা আদমের বিকৃত উচ্চারণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে বল্লাল চরিতের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ১৩৭৮ খৃস্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজত্বকারী আর একজন বল্লাল সেনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাঁর এ উক্তি মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলার ইতিহাসে বিজয় সেনের পুত্র ও লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বল্লাল সেনের নাম আমরা পাই না (অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি)। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরও যে কয়জন হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যেও কোনো বল্লাল সেনের

সন্ধান পাওয়া যায় না। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খৃ.) সর্বপ্রথম সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে নিয়ে বিক্রমপুর আর কোনদিন হিন্দু রাজাদের অধীনে আসেনি। পরবর্তীকালে ১৩৩৮ খৃস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর বর্ম রক্ষক ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এ সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এরপর থেকে সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর এলাকা মুসলিম ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। আর যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত যে সময় (১৩৭৮ খৃ.) বিক্রমপুরে দ্বিতীয় রাজা বল্লাল সেনের অস্তিত্বের দাবি করেছেন তখন তা ছিল ইলিয়াসশাহী বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতান ইলিয়াস শাহের (১৩৫৮-১৩৯১ খৃ.) কর্তৃত্বাধীন।

বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধ ও শহীদ উপাধি:

রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালের (১১৫৮-১১৭৯ খৃ.) গো কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম শহীদ একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা জেলার (তৎকালীন) বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামে তাঁবু স্থাপন করে আহার্যের আয়োজন করার জন্য তাঁর সৈন্যরা একটি গরু জবেহ করে। অকস্মাৎ একটি চিল মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গরুর গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে রাজার সেনা শিবিরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। এ সময় অন্য একটি চিল এসে প্রথম চিলটির থাবা থেকে গোশতের টুকরাটি ছিনিয়ে নিতে চায়। গোশতের টুকরাটি নিয়ে শূন্যে উভয় চিলের লড়াই বেঁধে যায়। ফলে এক সময় গোশতের টুকরাটি মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু সেনারা বুঝতে পারে যে, এটা কোনো জবেহ করা গরুর গোশত এবং তারা অবিলম্বে রাজা বল্লাল সেনকে এ সংবাদটি অবগত করায়। রাজা বল্লাল সেন তৎকালে বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন। রাজা এ ব্যাপারে তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, যবনরা (মুসলমান) তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদলসহ আগমন করেছে। কাজেই তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে যবনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যবন ও হিন্দুদের মধ্যে পনেরো দিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চললো। চতুর্দশ দিবসে হিন্দুরা তাদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি অনুভব করলো এবং যবনদেরকে অজেয় মনে করলো। সেনাবাহিনীর হতাশা লক্ষ্য করে পঞ্চদশ দিবসে রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়লাভসম্পর্কে রাজা নিজে নিশ্চিত ছিলেন না। পরাজয় ঘটলে যাতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) বাহিনীর হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের কোনোরূপ অমর্যাদা না হতে পারে এ জন্য তিনি যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুণ্ড (চিতা) প্রজ্বলিত করে গেলেন এবং পরিবারস্থিত মহিলাদেরকে পরাজয়ের সংবাদ,

পাওয়ার সাথে সাথেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তাবহন করার জন্য তিনি একজোড়া সংকেতবাহী কবুতরকে পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে দিলেন।

রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। মুসলিম সেনারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলো। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শাহাদত বরণ করলো। অবশেষে বাবা আদম তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়ে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করে যেতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর শাহাদত নিকটবর্তী। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ নামাযে রত হলেন। সুযোগ বুঝে রাজা ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজা বারবার তাঁর ঘাড়ে তরবারির আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, তাঁর শত আঘাত দরবেশের ঘাড়ে একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। রাজার বারংবার আঘাতের মধ্যেও দরবেশ তাঁর নামায পড়ে যেতে থাকেন। নিশ্চিন্তে নামায শেষ করার পর দরবেশ রাজাকে বললেন: নিজের তরবারি ত্যাগ করে আমার তরবারি নিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করুন। দরবেশের নির্দেশমতো রাজা দরবেশের শিরশ্ছেদ করলেন। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সবাই শাহাদত বরণ করলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর ও পোশাক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি রক্তাক্ত শরীর ও পোশাক ধুয়ে ফেলতে মনস্থ করলেন। নিকটেই একটি পুকুর ছিল। তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পুকুরের কিনারে পৌঁছে তিনি একের পর এক সমস্ত পোশাক খুলে ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু অভাবিত বিজয়ের আনন্দে পোশাক অভ্যন্তরের সংগোপনে রক্ষিত কবুতর দু'টির কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। রাজার অমনোযোগিতার কারণে কবুতর দু'টি মুক্তি পেয়ে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে উড়ে গেলো। প্রাসাদবাসী রমণীরা সংকেতবাহী কবুতর দেখে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্নান শেষে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ত্বরিত গতিতে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হলেন। কিন্তু সেখানে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। সে এক হৃদয় বিদারক কাণ্ড। রাজা দেখলেন, তাঁর পরিবার-পরিজন সবাই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দিয়েছে। কেউ বেঁচে নেই। দুঃখে ও অনুশোচনায় তিনি নিজেও জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এভাবে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজা বল্লাল সেন সপরিবারে আগুনে পুড়ে মরে 'পোড়া রাজা' উপাধি লাভ করলেন। এ উপাধি নিয়েই তিনি আজও জনগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে

আসছেন। আর অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম লাভ করলেন শহীদ উপাধি। দরবেশ শাহাদত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হলো। সমগ্র এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করলো।

৪.৬ জালালুদ্দিন তাবরিজী

মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানে শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি পীরের খিদমত করতে থাকেন এবং এমন খিদমত করেন যা কোনো গোলাম তার মনিবের এবং কোনো মুরীদ তার পীরের করতে পারে না। কথিত আছে, হজ্জ সম্পাদনের জন্য শায়খ সোহরাওয়ার্দী প্রতি বছর পদব্রজে বাগদাদ থেকে মক্কা আসতেন। শায়খ জালালুদ্দীনও পীরের সাথে পদব্রজে হজ্জ পালন করতেন। বার্ধক্যের দরুন হযরত শিহাবুদ্দীন কোন প্রকার ঠাণ্ডা খাদ্য খেতে পারতেন না। পীরকে গরম খাদ্য সরবরাহ করার জন্য শায়খ জালালুদ্দীন সারা পথ গরম চুল্লী মাথায় করে নিয়ে চলতেন। ক্ষুধার সময় সঙ্গে সঙ্গে চুল্লী নামিয়ে পীরের জন্য গরম খাবার উপস্থিত করতেন। তাঁর ধৈর্য, একাত্মতা ও দীর্ঘ সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে হযরত শিহাবুদ্দীন তাঁকে 'খিরকা-ই-খিলাফত' দান করেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পুরোধা শ্রেষ্ঠ সূফী ও দরবেশ এবং আধ্যাত্মিক জগতের নেতা হিসেবে পরিগণিত হয়রত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর সাথে তাঁর বাগদাদে পরিচয় হয়। হযরত মঈনুদ্দীন তৎকালে শায়খ শিহাবুদ্দীনের সাহচর্য লাভের জন্য বাগদাদে আগমন করেছিলেন। বাগদাদ থেকে শায়খ জালালুদ্দীন মক্কা, মদীনাসহ আরব, ইরাক ও ইরানের বহু শহর পরিভ্রমণ করার পর হিন্দুস্তানে পাড়ি জমান। এখানে মুলতানে অবস্থান কালে তাঁর একান্ত সুহৃদ ও সতীর্থ শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা তখন ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা। কুবাচার মুলতানের শাসনকর্তা থাকাকালেই জালালুদ্দীন তাবরিজী মুলতান ত্যাগ করে দিল্লীতে আসেন।

শামসুদ্দীন ইলতুতমিস (১২১০-১২৩৬ খৃস্টাব্দ) তখন দিল্লীর বাদশাহ। তিনি উলামা ও মাশায়েখদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁদেরকে যথাযোগ্য সমাদর করতেন। হযরত

শায়খ জালালুদ্দীনকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন। বাদশাহর এ সমাদর দেখে দিল্লীর তৎকালীন শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন। তিনি শায়খ জালালুদ্দীনের বিরোধিতা করতে থাকেন। জনৈকা দুশ্চরিত্রা মহিলাকে প্রলুব্ধ করে তিনি শায়খ জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেন। কতিপয় আলিম ও দরবেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর বাদশাহ এ সম্পর্কিত তদন্তের ভার দেন। শায়খ বখতিয়ার কাকী ও শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়াও ঐ কমিটিতে ছিলেন। কমিটি যথাযথ তদন্তের পর শায়খ জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে। বাদশাহ মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য শায়খুল ইসলামকে পদচ্যুত করেন। 'আখবার-উল-আখইয়ার', 'সিয়ার-উল-আউলিয়া' প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থে এ সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

এ ঘটনায় শায়খ জালালুদ্দীন অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে বাদায়ূনে যাত্রাবিরতি করেন। বাদায়ূন থেকে তিনি বাংলার তৎকালীন রাজধানী লক্ষণাবতীতে এসে পৌঁছেন। এখানে একদিন তাঁর মুরীদদেরকে বলেন: "এসো আমরা শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরার জানাযা পড়ি। তিনি আমাদের দিল্লী থেকে বহিষ্কার করেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে এ দুনিয়া থেকে বহিষ্কার করেছেন।"

বাংলায় আগমন:

'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ১১২৪ শকাব্দে (১১২৪+৭৮=১২০২ খৃ.) লক্ষণাবতীতে আগমন করেন। এ গ্রন্থ অনুসারে শায়খ জালালুদ্দীন রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালেই বাংলাদেশে আসেন এবং আসন্ন তুর্কী আক্রমণ সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক করে দেন। রাজা তাঁর অলৌকিক কাজে বিস্মিত হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সম্মানার্থে একটি দরগাহ নির্মাণ করেন ও কিছু ভূ-সম্পত্তিও দান করেন। এ সূত্র অবলম্বনে দেখা যায়, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বেই বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। কিন্তু ফার্সী ভাষায় লিখিত সূফীদের জীবনী গ্রন্থগুলোতে এ সূত্রের অনুকূলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফার্সী গ্রন্থগুলো থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্যগুলো থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি সত্য উপলব্ধি করা যায়। খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তী ১১৯২ খৃস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক দিল্লী ও আজমীর অধিকার করার পর উপমহাদেশে পদার্পণ করেন। কাজেই ১১৯২ খৃস্টাব্দের আগে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাগদাদে খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তীর সাথে পরিচিত হন। 'সিয়ারুল আউলিয়া' ও 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী বাগদাদে অবস্থান কালে যখন শুনলেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তী আজমীরে আবাস স্থাপন করেছেন তখন তিনি বাগদাদ থেকে

ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কাজেই ১২০৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর লাহোরে অবস্থান করার এবং তারপর শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ারও তাঁর সাথে মিলিত হওয়া সেই যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক মনে হয়। কারণ খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তী হিন্দুস্তানে প্রবেশ করে কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন। হযরত আলী আল হিজবিরীর (দাতা গঞ্জবশ) মাযারে তিনি চিল্লাও দেন। এ ছাড়াও কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ভারতে পৌঁছে নিশ্চয়ই আজমীরে কিছুকাল তাঁর শায়খের কাছে অবস্থান করেছিলেন। এ সব বিবেচনা করলে ১১৯২ থেকে ১২০৬ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ ১৪ বছর সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যবধান বলে মনে হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা ১২০৬ থেকে ১২১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময় মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। কাজেই ১২০৬ থেকে ১২১৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী মুলতান থেকে দিল্লীতে চলে আসেন। যদি ইলতুতমিসের রাজত্বের (১২১০-১২৩৬ খৃ.) প্রথম দিকেও তিনি দিল্লীতে আসেন তাহলেও অন্তত ১২১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাকে দিল্লীতে আসতে হয়। দিল্লীতে তিনি বেশিদিন অবস্থান করেননি। তাহলে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ খলজীর রাজত্বের (১২১৬-১২২০ খৃ.) প্রথমদিকে অর্থাৎ ১২১৬ খৃস্টাব্দে তিনি লখনৌতি পৌছেন বলা যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর 'তাবকাতে নাসিরী'তে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করার কারণে এ ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যথায় এর যথার্থ সুরাহা সম্ভব হতো। কাজেই এ আলোচনা থেকে মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বা বড় জোর ১২১৬ খৃস্টাব্দের পর বাংলাদেশে আসেন।

শুভোদয়া গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর সম্পর্কিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা থেকে এ কথা সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'শেক শুভোদয়া'র বর্ণনা মতে, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষ্ণণ সেন তাঁকে পাণ্ডুয়ার একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ মসজিদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ (আবাসিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র) পরিচালনার জন্য তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন।

ইসলামের প্রচার-প্রসার:

মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে, শায়খ জালালুদ্দীনের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহণ। 'তাজকিরায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ' গ্রন্থেও প্রায় একই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তাজকিরায় বলা হয়েছে, জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলায় পৌঁছার পর অল্প দিনের মধ্যে সর্ব-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর জন্য একটি

খানকাহ নির্মীত হয়। তিনি বহু জমি ক্রয় করে সেগুলোকে বাগানে রূপান্তর করেন। অতঃপর মুসাফির ও সেখানে অবস্থানরত লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য সেগুলো 'ওয়াকফ' করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতিপয় প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দিরের উপাসনাকারীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। 'মেমরিস অব গৌড় এন্ড পান্ডুয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দরবেশ পাণ্ডুয়ায় এবং বাংলার আরো বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করেন। যেমন দেওতলা ও বাইশ হাজারী নামে পরিচিত স্টেটটি এখনও 'ফকির' ও দরিদ্রদের প্রতিপালনের জন্য একজন মুতাওয়াল্লীর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। শায়খ জালালুদ্দীন বাংলায় আগমন করে মূর্তি ভাঙ্গা শুরু করেন এবং সম্ভবত তাঁর নির্মীত বিভিন্ন চিল্লাখানা প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলোর যথার্থ স্থান নির্দেশ করে।

প্রভাব বিস্তার:

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলার রাজধানীতে বসে একদিকে বাংলার শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং অন্যদিকে সাধারণ সমাজের বৌদ্ধ, হিন্দু নির্বিশেষে সকল মানুষকে ইসলামের সত্যবাণীর প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকেন। বাংলার সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য তিনি সেবামূলক কার্যসূচিও গ্রহণ করেন। ব্লকম্যান তাঁর 'কনট্রিবিউশান টু দি জিওগ্রাফি এন্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ভিক্ষুক ও মুসাফিরদের জন্য একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এভাবে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে তিনি প্রায় ২৩ বছরকাল একাধারে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ফলে লখনৌতি তথা বাংলার সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মুসলিম সমাজের আকৃতি স্ফীত হতে থাকে এবং সমসাময়িক কালে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তা সহায়ক শক্তির কাজ করে। পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'খানকাহ' নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী করে। তার এ খানকাহ ছিল তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল।

ইন্তেকাল :

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু-সন ও মাযার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ৭৩৮ হিজরী অর্থাৎ ১৩৩৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ব্লকম্যান কোনো প্রকার সূত্র উল্লেখ না করেই ১২৪৪ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-সন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খান সাহেব আবেদ আলী রচিত

'মেমরিস অব গৌড় এন্ড পাওয়া' গ্রন্থের টীকাকার এইচ. ই. স্ট্রেপেলটন ১৩৪৬ বা ১৩৪৭ খৃস্টাব্দকে তাঁর মৃত্যু-সন বলে অনুমান করেন। শায়খ আবদুল হক দেহবলী, আবুল ফজল, ফেরেশতা তার মৃত্যু-সন সম্পর্কে নীরব। তাজকিরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন ৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ৬২০ হিজরীতে (১২২৩ খৃ.) বাংলা ত্যাগ করেন।

'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে ৭৩৮ হিজরী হিসেবে যে তারিখটি উল্লিখিত হয়েছে তা শায়খ জালালুদ্দীনের সমাধিতে প্রাপ্ত ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ একখানা শিলালিপির অক্ষর-সমষ্টির আবজেদ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান থেকেই গৃহীত হয়েছে। এ শিলালিপিতে সময় নির্দেশক যে ফার্সী বাক্যটি উৎকীর্ণ ছিল তা হচ্ছে: "জালালুদ্দীন জালালুল্লাহ্ জালালে আরেফাঁ বুদ।" কিন্তু 'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা'র লেখক নিজে এ শিলালিপিটি দেখেননি। এ শিলালিপিটি তৎকালে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই তিনি লোকমুখে শিলালিপিটির কথা শুনেছিলেন এবং জনসাধারণের স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করে তাতে উৎকীর্ণ বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন। এদিক থেকে এ তারিখটির দুর্বলতা সুস্পষ্ট। এ দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করেই আমরা বলতে চাই যে, শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯-১২৬৬ খৃ.) ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (১১৪২-১২৩৬ খৃ.) সমসাময়িক এক ব্যক্তির ১৩৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কাজেই ১৩৩৭ খৃস্টাব্দকে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু-সন হিসেবে গ্রহণ করাকে আমরা মোটেই সঙ্গত মনে করি না। 'পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো'র লেখক চৌধুরী শামসুর রহমান ৭৩৮ হিজরী সনকে (সম্ভবত) ভুলক্রমে ১২৩৭ খৃস্টাব্দ গণ্য করে ১০০ বছর পিছিয়ে এসেছেন এবং ১২৩৭খৃস্টাব্দকে স্বাভাবিক মনে করে এটিকেই শায়খ জালালুদ্দীনের মৃত্যু-সন গণ্য করেছেন।২৩ তাজকিরায় (১২২৫ খৃ.) তারিখটি 'শেক শুভোদয়া'য় উল্লিখিত শায়খ

জালালুদ্দীনের বাংলা ত্যাগের কাছাকাছি বলে এ তারিখটিকেই আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারি। কাজেই আমাদের মতে ১২২৫ খৃস্টাব্দে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ইন্তিকাল করেন।

মওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর সমাধি বাংলায় অবস্থিত। কিন্তু তিনি কোনো স্থান নির্দেশ করেননি। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাঙ্গালার বন্দর দেওমহলে শায়খ জালালুদ্দীনের

কবর অবস্থিত। সিয়ারুল মুতাআখখিরীনে বলা হয়েছে: দেওমহল বন্দরে তাঁর সমাধি অবস্থিত। ২৪ শায়খ জালালুদ্দীনের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ (১৩৪১-৪২ খৃ.) তাঁর মাযার নির্মাণ করেন। রিয়াজে এ সম্পর্কিত যে ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দীন আলী মুবারক শাহ স্বপ্নযোগে পাওয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে (দেওতলা) শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মাযার নির্মাণে আদিষ্ট হন। সীয়ার ও আইনে আসলে এ দেওতলাকেই দেওমহল বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিম্মানী কর্তৃক জৌনপুরের শর্কী সুলতান ইবরাহীম শর্কীর কাছে লিখিত একখানি পত্রে তিনি জালালীয়া তরীকার সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন বলে উল্লেখ করেন। জালালী সূফী দ্বারা তিনি জালালুদ্দীন তাবরিজী ও তাঁর শাগরিদদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ পাণ্ডুয়া থেকে পনের মাইল উত্তরে দেওতলাতেই তাঁর খানকাহ স্থাপন করেছিলেন। ৮৬৮ হিজরীতে (১৪৬৪ খৃ.) উৎকীর্ণ একটি মসজিদের শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে 'কসবা তাবরিজাবাদ' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। বাংলা ও উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতান সুলায়মান কররানীর (১৫৬৫-১৫৭২ খৃ.) আমলে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে সুস্পষ্টভাবে তাবরিজাবাদ ওরফে দেওতলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ স্থানকেই নিজের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলার ইতিহাসে এতবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বাংলার সমগ্র এলাকায় তাঁর নাম ও কার্য-প্রভাব এত বেশি বিস্তৃত হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুর ১২০ বছর পরে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলা সফরে এসে সিলেটের হযরত শাহ জালাল মুজাররাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জালালুদ্দীন তাবরিজী রূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইবনে বতুতার এ বর্ণনার কারণে কেউ কেউ পাণ্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও সিলেটের শায়খ শাহ জালাল মোজাররাদকে অভিন্ন মনে করেছেন। অথচ উভয়ের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কয়েক'শ মাইলের ব্যবধান রয়েছে। ইবনে বতুতা ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। তখন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০ খৃ.) ছিলেন বাংলার সুলতান। ইবনে বতুতা কামারু পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখানে নদী পথে সোনারগাঁও আসেন। সোনারগাঁও দিয়ে আরাকানের পথে জাভা-সুমাত্রা হয়ে তিনি চীনে গমন করেন এবং সেখানে শেখ বুরহানুদ্দীনের কাছ থেকে শাহজালালের মৃত্যু সংবাদ পান।

ইবনে বতুতা কামারু বলতে আসলে কামরূপকে বুঝিয়েছেন। তৎকালে পূর্বদিকে বঙ্গের সীমানার পর থেকে কামরূপের সীমানা শুরু হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত সিলেট জেলা ছিল তার অন্তর্গত। অর্থাৎ ইবনে বতুতা সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে বতুতার বাংলা সফরের ১২০ বছর পূর্বে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মৃত্যু হয়েছিল। একমাত্র ইবনে বতুতাই সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদকে জালালুদ্দীন তাবরিজী বলে অভিহিত করেছেন। সিলেটের শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানী ছিলেন, না তুর্কীস্তানজাত বাঙালী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু ইবনে বতুতা ছাড়া আর কেউ তাঁকে তাবরিজী বলেননি। উপরন্তু ইবনে বতুতা কোথাও তাঁকে বলেছেন তাবরিজী আবার কোথাও বলেছেন শিরাজী। এ থেকে কমপক্ষে নামের ব্যাপারে ইবনে বতুতার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়।

ইবনে বতুতা ২৫ বছর ধরে বিশ্ব ভ্রমণ করেন। এ ২৫ বছরে তিনি মরক্কো থেকে নিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশ সফর করেন। পথে একাধিকবার তিনি দস্যুর কবলে পড়েন। ফলে অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে তাঁর সফর সম্পর্কিত ডায়েরীগুলোও লুণ্ঠিত হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ৭৫৬ হিজরীতে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী বছর মরক্কোর সুলতানের সেক্রেটারী ইবনে জওযী তার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেন। বর্তমান জগতে ইবনে বতুতার সফরনামার যতগুলো সংস্করণ দেখা যায় তা এ ইবনে জওযীর সংক্ষিপ্ত সারের বিভিন্ন অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই নামের ক্ষেত্রে স্মৃতি বিভ্রম বশত ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে শাহজালাল মুজাররাদের জালালুদ্দীন তাবরিজীতে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম এলাকায় শাহজালাল মুজাররাদ সম্পর্কে এ কথা যতটুকু সত্য, উত্তর বঙ্গে জালালুদ্দীন তাবরিজী সম্পর্কেও সেই কথা সমানভাবে সত্য। এমন কি উত্তর বঙ্গের সীমা অতিক্রম করে সারা বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য ও অতুলনীয় বলে স্বীকার করতে হবে। বস্তুত তিনি যে বাংলার প্রথম যুগের ইসলামী চিন্তা, বিশ্বাস ও সমাজ কাঠামোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাতা এবং বাংলার ইসলাম প্রচারকদের আদর্শ ও পথিকৃৎ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

৪.৭ খান জাহান আলী (যশোর-খুলনা)

যশোর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজ-

বিধি প্রবর্তনে হযরত উলুগ খান-ই-জাহান বা খান জাহান আলীর. নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এ দুই জেলায় ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শাগরিদকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

হযরত উলুঘ খানজাহান আলি ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ... খানজাহান আলি ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনা বাহিনীতে সেনাপতির পদে কর্ম জীবন আরম্ভ করেন।তার পিতার নাম আকবর খাঁ এবং মাতার নাম আম্বিয়া বিবি । অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। ১৩৯৪ এ মাত্র ২৬/২৭ বছর বয়সে তিনি জৈনপুর প্রদেশের জাবিতান (গভর্নর) পদে যোগ দেন। তিনি কিভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করে একটা নুতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত খান জাহান সম্পর্কে বহু মতভেদ আছে কেউ কেউ বলেছেন তিনি পারস্য দেশীয় একজন মুসলমান ছিলেন। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে তিনি আরবের ইয়েমেনে প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গ বিজয় :

গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খৃ.)আমলেই হযরত খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং এ সমগ্র এলাকার শাসনভার লাভ করেন। পয়গ্রাম কসবাতে তাঁর রাজধানী ছিল। কাজেই তিনি যে তদানীন্তন বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সততা, জনসেবা ও চরিত্র-মাধুর্য এ অঞ্চলের জনগণের ওপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা তাঁকে আল্লাহ্র একজন যথার্থ অনুগত বান্দা এবং সূফী ও দরবেশ মনে করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলমান হিসাবে তুলে ধরেন এবং জনগণের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে জনগণের সেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের হিতার্থে তিনি এলাকায় বহু রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, অসংখ্য দীঘি খনন এবং বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জনগণ তাঁর দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাঁর অনুকরণে তারাও বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের জনসেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেয় । যশোরঅঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খান জাহান আলী প্রথমে এখানকার অতি প্রাচীন নগরী বারোবাজারে আগমন করেন। এখানে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং

ইসলামী ইবাদতের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য গড়ে তোলেন একটি সুরম্য মসজিদ। এ মসজিদটি এখনও বর্তমান আছে।' এ ধরনের মসজিদ বারোবাজার থেকে বাগেরহাটের পথে তিনি বেশ কয়েকটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইসলাম প্রচার :

বারোবাজার মূলত উত্তর বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্ধনের ন্যায় নিম্ন বঙ্গের বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। হযরত খান জাহান আলী যখন এখানে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রচার মাহাত্ম্যে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দুর মনে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানদের নামানুসারে এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি গ্রাম। মুরাদগড়, সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর ও রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম তার পরিচয় বহন করছে। " বারোবাজার থেকে তিনি যশোহরের কয়েকটি স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের শাগরিদদের প্রেরণ করেন। এঁদের মধ্যে বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ অন্যতম। তাঁর অন্য শাগরিদদের মধ্যে বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁ, মোহাম্মদ তাছির ওরফে পীর আলী, মীর খাঁ, চাঁদ খাঁ, এখতিয়ার খাঁ, মেহের উদ্দীন, বখতিয়ার খাঁ, পীর জয়ন্তী ও আলম খার নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁ খানপুর ও বিদ্যানন্দকাঠি অঞ্চলে বহু অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আমাদি গ্রামে তাঁরা একটি গুম্বজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি আজও বিদ্যমান আছে।

তাঁর অন্যতম প্রধান শাগরিদ পীর আলী পূর্বে হিন্দু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় মোহাম্মদ তাছির। তিনি বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে ইসলামে দীক্ষিত করেন বলে জানা যায়। তিনি যেসব ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষিত করেন তারা এখনও এতদঞ্চলে পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। মাগুরার পীর-জয়ন্তীও পূর্বে হিন্দু ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায় ।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র:

মূলত যশোর ও খুলনার সমগ্র এলাকা ছিল খান জাহান আলীর কর্মস্থল। এ দুই জেলায় তিনি ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। বাগেরহাট শহরটি তাঁরই নির্মীত এবং তিনি তার নামকরণ করেন খলীফতাবাদ। বাংলার সুলতানদের মধ্যে একমাত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ-ই খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরীর (১৪৫৭ খৃ.) একটি শিলালিপিতে এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কয়েকটি মুদ্রাতে তাঁকে খলীফা উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। সম্ভবত সুলতানের এ উপাধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত শহরের খলীফতাবাদ নামকরণ করেন। বাগেরহাটের সুরম্য ষাট গম্বুজ মসজিদ তাঁর একটি

মহান কীর্তি। বস্তুত বাংলার এ দক্ষিণাংশে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কৃতিত্বের সিংহভাগই যে হযরত খান জাহান আলীর প্রাপ্য তাতে সন্দেহ নেই ।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দিল্লিতে এসে তার দক্ষতা ও কর্মকৌশল তা বলে তৎকালীন দিল্লীর সুলতানের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেছিলেন।দিল্লিতে এসেছি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় বংশানুক্রমে খান জাহান উপাধি প্রাপ্ত হন।১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি খানজাহান আলী উপাধি লাভ করেন।অতঃপর তিনি দিল্লী হতে বাংলাদেশে আগমন করেন।হযরত খানজাহান আলী দিল্লিতে কিছুদিন বংশীয় সুলতানের সেনাপতি পদে থেকে রাজনগরের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র বিদ্রোহ নরহত্যা প্রভৃতি দেখে সংসার ধর্মে বিতৃষ্ণা ও ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে আগমন করে তিনি প্রথমে বারবাজারে তার আস্তানা প্রতিষ্টিত করেন। যে হযরত খানজাহান আলী একজন ধর্মপ্রাণ ও ধর্ম প্রচারক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।তিনি ১২ জন আউলিয়া সহ এ বার বাজারে এসেছিলেন বলে এই স্থানের নাম বারোবাজার হয়েছিল। বারোবাজার স্থানটি যশোর শহর হাতে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে খানজাহান যশোরের বারবাজারে অবস্থান নেন এবং বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার আরম্ভ করেন।

হযরত খানজাহান (রঃ) এর মাজারগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠ করে তাঁর কিছুটা পরিচয়ের সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এ সাধকের প্রকৃত নাম ও বিসত্মারিত পরিচয় আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। উক্ত শিলালিপিতে তাঁর নাম পরিচয়“ খানে আযম খানজাহান” ও “উলুঘ খানহাজান”লেখা আছে। শিলালিপিতে আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর মৃত্যু তারিখ ৮৬৩ হিজরী ২৬ জিলহজ্ব বুধবার (মোতাবেক ১৪৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর মতামতরে ২৪ অক্টোবর) উলেস্নখ আছে। “উলুঘ ” তুর্কী শব্দ এবং তা পারিবারিক উপাধি । এ থেকে ধারণা করা যায় তিনি উলুঘ নামক কোন এক তুর্কী পরিবারের সমতান । কোন কোন লেখকের মতে তিনি পারস্য মতামতরে আরব দেশ থেকে দিলস্নী হয়ে এ দেশে আসেন । তুর্ক- আফগান আমলে সেনাপতির সম্মানিত উপাধী ছিল খানে আযম । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন সেনা নায়কও ছিলেন এবং “খানে আযম খানজাহান” উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল । এ মহান সেনা নায়ক ও সাধক তাঁর নিজ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখে যাননি। লোক পরম্পরায় তাঁকে সবাই খানজাহান আলী (রঃ) নামেই চিনে এসেছে।

খানজাহান (রঃ) এমন এক মহাপুরম্নষ ছিলেন যাঁর মহতী গুনাবলীর দ্বারা বাগেরহাটসহ সমগ্র ভাটি অঞ্চল উপকৃত ও ধন্য হয়েছে। কথিত আছে এ মহাপুরম্নষ মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ

হয়ে যশোরের বারোবাজার থেকে শুরম্ন করে সমগ্র ভাটি অঞ্চল জুড়ে ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন। মুসলমানদের প্রথম আ
বাদকৃত এ অঞ্চলে উপাসনার জন্য মসজিদগুলি এবং নোনা পানির দেশ ভাটি অঞ্চলে পানীয় জলের এ দীঘিগুলি আপামর জনগণের কাছে খোদার আশীর্বাদের মতই প্রতিভাত হয়েছিল। আরও কথিত আছে, এ দেশে আগমনের সময় তাঁর সাথে যে ৩৬০জন আউলিয়া এসেছিলেন সম্ভবতঃ তাঁদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন। প্রথমে শাসকরূপে জীবন শুরম্ন করলেও পরবর্তীতে ধর্ম চিমত্মা ও জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতাবান মহাপুরম্নষ । দুঃস্থ মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন বিতরণ, জলকষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য দীঘি খনন, রাসত্মাঘাট নির্মাণ,হাট-বাজার স্থাপন, মানুষের ধর্মীয় উপাসনার জন্য অপূর্ব স্থাপত্য সুষমামন্ডিত অগণিত মসজিদ নির্মাণ প্রভৃতি অসংখ্য কীর্তিরাজি কালের শত ভ্রম্নকুটি উপেক্ষা করে আজও সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার বাণী বহন করে চলেছে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের বিসত্মীর্ণ জনপদের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি ঘরে ঘরে।

যোদ্ধা পরিচয়ে আগমন

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, খানজাহান আলী ছিলেন 'একজন সুফিসাধক এবং বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত এলাকার আঞ্চলিক শাসক'।

তিনি পনেরো শতকের প্রথমার্ধে তৎকালীন খলিফাতাবাদ যা এখন বাগেরহাট নামে পরিচিত, তার শাসনকর্তা হন।
প্রথমে দিল্লির সুলতানের কাছ থেকে এবং পরে বাংলার সুলতানের কাছ থেকে সুন্দরবন বনাঞ্চল জায়গীর লাভ করেন।
বাংলায় তার আগমন ঘটেছিল একজন যোদ্ধা হিসেবে। ইতিহাসবেত্তাদের মতে__
"খানজাহান আলী বাংলায় আগমন করেন একজন সেনাপতি হিসেবে।
তবে যোদ্ধা পরিচয় ছাপিয়ে তার জনহিতকর কাজ এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারক পরিচয়ই শত শত বছর ধরে মানুষের মনে আছে।"

১৫শ শতকের প্রচলিত ব্যাপার ছিল যে শাসক, বা সেনাপতির মত শীর্ষ পদের অধিকারী ব্যক্তিদের হাত ধরে ধর্ম প্রচার, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং প্রসার হয়েছিল।

তিনি বলছেন, শাসক হিসেবে কাজ শুরু করে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন চিহ্নিত করে কাজ করেন।
রিচার্ড এম ইটন নামে একজন অ্যামেরিকান ইতিহাসবিদের লেখা 'দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার' নামে বইয়ে বলা হয়েছে, সুন্দরবনের কাছে বাগেরহাট অঞ্চলে লবণাক্ত পানির বদলে মিঠা পানির ব্যবস্থা করার জন্য দিঘী খনন করে খানজাহান আলী জনপ্রিয়তা পান।

তার সময়ে স্থানীয়ভাবে কোন নিপীড়ন বা সহিংসতার কথা শোনা যায় না।
খানজাহান আলীর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং খানজাহান আলী দিঘি বা খাঞ্জালি দিঘি অন্যতম।
ষাটগম্বুজ মসজিদ ইউনেস্কোর দেয়া বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটি।
খুলনা জেলার বাগেরহাটে তাঁর সমাধি অবস্থিত। সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে : "আল্লাহর এক নগণ্য দাস, বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ-প্রত্যাশী, রসূলে করীম (সা)-এর বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী উলুগ খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬ যিল্‌হজ্জ বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন।"

অধ্যায় ৫ : অলি-আউলিয়ার দাওয়াতী কার্যক্রমের পদ্ধতি

৫.১ মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকা স্থাপন:

বাংলায় ইসলামের আগমনের পর সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক ছিল ধর্মীয়–শিক্ষামূলক অবকাঠামো গড়ে ওঠা—যার মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা (খানকাহ্‌) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আরব–ফারসি বণিক, সুফি দরবেশ ও পরবর্তীতে মুসলিম রাজনৈতিক

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮ম–১৩শ শতকে পূর্ববাংলা জুড়ে ধারাবাহিকভাবে এসব কেন্দ্র গড়ে ওঠে।
খানকা ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজসেবা, দাওয়াত ও দরিদ্র জনগণের আশ্রয়দানে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতপাত বা বর্ণভেদ ছাড়া সকল মানুষ প্রবেশ করতে পারতেন—যা তৎকালীন ব্রাহ্মণিক সমাজ কাঠামোর সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্স পরবর্তীকালে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে—আরবি-ফারসি ভাষা, কুরআন -হাদিস, ফিকহ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা সংহত হয়।

বাংলার প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে ওয়াইজঘাটের মাটির মসজিদ, জাহাজঘাট মসজিদ (১২শ শতক), পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাথমিক স্থাপনা, আর পরবর্তীতে সুলতানি আমলে বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রি.), আটিয়ার মসজিদ (১৬০৯) – এগুলো বাংলায় মসজিদ স্থাপনার ধারাবাহিকতা দেখায়।
সুফি খানকার প্রমাণ পাওয়া যায় চান্দপুর, চট্টগ্রাম, মহাস্থান ও সাতক্ষীরার আরবীয় সন্ন্যাসী-দরবেশদের কবর ও স্থানীয় মানুষের মৌখিক ইতিহাসে।

৫.২ লঙ্গরখানা চালু

বাংলা অঞ্চলে সুফি–দরবেশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লঙ্গরখানা ছিল ইসলামী সমাজসেবার সবচেয়ে মানবিক দিকগুলোর একটি। লঙ্গরখানা (Free kitchen) ছিল সদাকাহ-ভিত্তিক বিনামূল্যে আহার—যেখানে দরিদ্র, আশ্রয়হীন, নিপীড়িত সকল মানুষ ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে খাবার পেত।
এই প্রথা সুফি নেটওয়ার্ককে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলে। বাংলার নিম্নবর্ণ, দলিত সম্প্রদায় ও জমিদার-সামন্তশাসনের শোষণে ক্লান্ত কৃষিজীবী মানুষেরা এই লঙ্গরখানাকে “নিরাপদ কেন্দ্র” মনে করতেন।
ক্ষুধার্ততে খাবার খাওয়ানো ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন– *“তারা নিজেদের প্রয়োজন ও আশক্তি থাকা সত্ত্বেও মুখাপেক্ষী ফকীর, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ায়।” [সূরা দাহর: ৮]*
এই সকল সুফী আউলিয়ারা নিজেরাই রান্না করে ক্ষুধার্তদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

লঙ্গরখানার উল্লেখ পাওয়া যায় সিলেট অঞ্চলে হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনী (রহ.), সাতক্ষীরা–যশোর অঞ্চলে শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.), চট্টগ্রামে শাহ সুফি সুলতান বাকতিয়ার (আ.) এর ইতিহাসে।

৫.৩ ইলমের আলোকচ্ছটা:

বাংলায় ইসলাম আগমনের পর "ইলম" বা জ্ঞানের ধারণা এক নতুন পরিধি তৈরি করে। এই অঞ্চলে আগত পীর আউলিয়া একেকজন ছিলেন যেন ইলম ও প্রজ্ঞার মহাসমুদ্র। যদিও লোকমুখে কেবল তাদের আধ্যাত্মিক কারামতের ঘটনাই বেশি বিস্তৃত। আরবি–ফারসি ভাষা শেখা, কুরআন–হাদিস, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা (মন্তিক), চিকিৎসাবিদ্যা—এসব বিষয়ের সমন্বয়ে তারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

ইলম ছিল বর্ণহীন জ্ঞান—যা ব্রাহ্মণিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো জন্মগত সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত ছিল না। এ কারণে নিম্নবর্ণ ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের জ্ঞান-ব্যবস্থা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সুলতানি আমলে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-হুসাইনিয়া (গৌড়), সোনারগাঁওয়ের ইলমকেন্দ্র, এবং পরবর্তীকালে চাঁদপুর–বগুড়া–বরেন্দ্র এলাকায় মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক বাংলার ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল।

মাদ্রাসা থেকে গড়ে ওঠা আলেম–ফকিহরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে নয়, প্রশাসনিক কাজেও যুক্ত ছিলেন।

৫.৪ শাসকবর্গকে নসীহত :

সুফি-আলেমরা শুধু সমাজের দরিদ্র,নিন্মবর্ণের নি মানুষকেই নয়, শাসকবর্গকেও নিয়মিত নসীহত (নৈতিক উপদেশ) দিতেন।

মুসলিম রাজনৈতিক দর্শনে শাসকের প্রধান দায়িত্ব—

ন্যায়বিচার, কর-শোষণ পরিহার, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নসীহত ও পরামর্শ দিতেন।

মুসলিম শাসক, সুলতানরাও সেসকল আলেম আউলিয়াদের নসিহত গ্রহণ করতেন। দেখা যায় নুরুল কুতুবুল আলম ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এর সহপাঠী ও বন্ধু।

বাংলার সুফিরা এ মূল্যবোধগুলোর প্রচার করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রমুখ শাসকের দরবারে আলেম–সুফিদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় “রিয়াজুস সালাতিন”-এ।

নসীহতের ধারাটি প্রশাসনকে “নৈতিক জবাবদিহি”-র বন্ধনে রাখত—যাতে প্রজাশোষণ কমে, সামাজিক স্থিতি বাড়ে।

৫.৫ বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদে অংশগ্রহণ:

বাংলাদেশে আগত সুফি, পীর আউলিয়াদের মূলত কার্যক্রম ছিল শান্তিপূর্ণ দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার। তবে বাংলার ইতিহাসে কয়েকবার দেখা যায়—

যখন অত্যাচারী শাসক দ্বারা প্রজারা নির্যাতিত হয়েছে, হিন্দুত্ববাদের প্রভাবে অরাজকতা তৈরি হয়েছে, বা বৌদ্ধ–হিন্দু সামন্তদের শোষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন এই সকল আউলিয়ারা এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহর জমিনের উপরে কোন অসহায়ের উপরে হওয়া জুলুমে তারা নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছন নিজেরাই এবং পরিচালনা করেছেন।

ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন উল্লেখ করেন—

“Islamic expansion in Bengal was not a military conquest but a cultural, social, and at times defensive movement of oppressed communities.”

অধ্যায় ৬ : যাযাবর বেদে সম্প্রদায়

বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নাম বেদে সম্প্রদায়। বাংলা একাডেমির তথ্য অনুযায়ী এটি আরবি "বাদিয়াহ" শব্দ থেকে এসেছে। "বাদিয়াহ" শব্দের অর্থ যাযাবর। তাই বেদে মানেও ভ্রমণশীল বা ভবঘুরে। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে তারা বাদিয়া, বেদিয়া, বাইদিয়া, বেদে, বেদেনী, বাইদ্যা, বাইদ্যানী, সাপুড়ে, সাপুড়িয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ১৭লাখ বেদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নদীনির্ভর বাংলাদেশে বেদেদের বাহন নৌকা। নৌকায় সংসার আবার নৌকা নিয়ে তারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ধর্মের দিক দিয়ে তারা মুসলিম। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজার সংলগ্ন খৈইরা এলাকায় বেদেদের বিশাল একটি অংশ বসবাস করে। সেখানে তাদের কয়েকটি লোকালয়ও গড়ে উঠেছে। তাদের দাবি মতে-এখানেই দীর্ঘ দিন ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছে। এছাড়াও সমাজবদ্ধভাবে সম্প্রতিকালে তাদের আরো কয়েকটি পল্লী গড়ে উঠে। যেমন আমিন বাজারের আশে পাশে এবং সাভারে, ঢাকা রামপুরায়, ঢাকা সাইনবোর্ড এলাকায়।

এছাড়াও সাভার, সুনামগঞ্জ, গাজীপুরের জয়দেবপুর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, মিরসরাই, তিনটুরী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, এনায়েতগঞ্জ, ফেনীর সোনাগাজী, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এসব বেদেরা ব্যবসায়িক কারণে অস্থায়ী বাসবাস করে থাকে। কেউ কেউ আবার সেখানেই জায়গা-জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তবে তাদের আধিকাংশ লোকেরই স্থায়ী বসবাসের জন্য কোন জায়গা-জমি নেই। তাদের জীবনমরণ সেই নৌকাতেই। আবার তাদের মধ্যে যারা জায়গা জমি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন, এটাও খুবই সংকীর্ণ। কারণ পুরুষরা হকারী ব্যবসায় জড়িত এবং সাপুড়ে, ডুবুরী, যাদুসহ অন্যান পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মহিলারা সিঙ্গা, দাঁতের পোকা সারানোর কবিরাদি ব্যবস্যা করে। যেহেতু এই ব্যবসাগুলো বিভিন্ন গ্রামে-গ্রামে এবং লোকালয়ে অথবা বাজারে করতে হয়; তাই তাদের বছরের অধিকাংশ সময় বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী বসবাস গড়ে তুলতে হয়। সাধারণত তারা ছোটছোট নৌকা করে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নদীর পাড়ে অথবা স্কুলের মাঠের কোনায়, সরকারি কোন পরিত্যাক্ত জায়গায় বা রাস্তার পাশে অস্থায়ী তাবু নির্মাণ করে সেখানেই তারা মানবেতর জীবন যাপন করেন। দশদিন অথবা পনের দিনের জন্য মঞ্জিল করে থাকেন এবং উক্ত দিনগুলোতে তারা ঐ সমস্ত এলাকায় তাদের পরিভাষায় গ্রাম করে থাকেন। এভাবেই তারা এক-এক এলাকা থেকে এক-এক এলাকায় পাড়ি জমান। আর এ নিয়মেই তারা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান।

এভাবে বেড়ে উঠে তাদের শিশুরাও, জন্মের পর থেকেই তারা মা বাবার সাথে শুরু হয়ে যায় তাদের জীবন যুদ্ধের অভিযাত্রা। নৌকায় রান্না নৌকায় খাওয়া সেখানেই আবার রাত্রি যাপন। রাত্রি শেষে সকালের সূর্য আলোকিত হওয়ার পরেই আবার ছুটে চলে গ্রাম থেকে গ্রামে মায়ের পিছে-পিছে জিবীকার তাগিদে। এরা পায় না শিক্ষার আলো, এরা জানেনা শিক্ষিত হয়ে মানুষ কী করে। স্কুল মাদরাসা বলতেই তারা বুঝে এখানে ছেলে মেয়েরা দলবেঁধে আসে আবার চলে যায়। ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তারা মা-বাবার থেকে শিখে আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্ম ইসলাম আমাদের আল্লাহ এক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যাযাবরের জীবন যাত্রা। কেউ জানে না এরা কারা কোথায় থেকে তাদের আগমন আর কোথায় এই বেদে সম্প্রদায়ের অভিযাত্রা। তারা সমাজের সব জায়গায় ঘৃণিত অবহেলিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত বৈষম্যের শিকার। শুধু তাই নয়, তারা মুসলিম হয়েও মুসলিম কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার শিকার। তারা মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়তে গিয়েও নামাজ পড়তে পারে না; কারণ তারা নিচু জাতির লোক। এমনকি ঈদের দিনেও তারা স্থানীয় মুসলিমদের সাথে একত্রে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার অধিকার পায়নি। স্থানীয়রা নামাজ পড়ে যাওয়ার পর ঈদগাহে দ্বিতীয়-তৃতীয় জামাত হত বেদে মুসলিমদের। যদিও বা এই সাম্প্রদায়িকতা এখন আর আগের মতো নেই। সাম্প্রতিক কালে তারা বাংলাদেশ সরকারের নাগরিকত্বও পেয়েছে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই আবার এখন অনেকে ইউ.পি মেম্বারও হয়েছে। কিন্তু তাদের আদি যাত্রার কথা কেউ জানে না।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার একটি গবেষণায় বেদে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায়। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী
প্রাথমিকভাবে ২০০৮ সালের এক গবেষণাপত্রে তাদের কৃষ্টি কালচার ও অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়ব। বর্তমান তাদের অবস্থান সর্ম্পকে জানতে এই ইনস্টিটিউট এর সকল ছাত্রদের পাঁচ দিনের একটি সফর ছিল মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া বাজারের পাশের বেদে পল্লীতে। স্থানীয়দের পরিভাষায় তাদেরকে মান্থা বলা হয়। আর স্থানীয়দেরকে বলা হয়, গিরহস্থ। এদের মাঝে যারা মোটামোটি ধর্মীয় জ্ঞান রাখেন তাদের থেকে তাদের আদিযাত্রার কথা এভাবেই জানা যায়।
"আমাদের পূর্বপুরুষরা ইয়ামান থেকে নৌকা যোগে ইসলাম প্রচার করে এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছিলেন। যেহেতু ভূমিতে এখনো ইসলামী রাজ্য কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই আমরা এখনো নৌকায় বসবাস করছি। যখন সমতল ভূমিতে ইসলামী রাজ কায়েম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন থেকে আমরা ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করব।"
অথচ তাদের মাঝে ইসলাম সর্ম্পকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই। তারপরও তাদের- আমার ধর্ম ইসলাম।

"আমি মুসলিম, আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"___ এই তিনটি কথার ওপর এতই মজবুত যে, তাদেরকে কোন লোভ লালসা এবং ভয়-ভীতি তাদের অন্তর থেকে তা সরাতে পারেনি।
২০০৮ সালের জাতীয় দৈনিকে রিপোর্ট হয়েছিল যে, খ্রিস্টান-মিশনারিদের দেওয়া নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা। আসলে বেদে সম্প্রদায়ের দরিদ্রাতার সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদেরকে নৌকা বানিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে

চেয়েছিল। কিন্তু সেবার নামে যখন তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তখনি তাদের মাঝে জেগে-উঠেছে ঈমানি চেতনা। তারা মিশনারিদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমরা মুসলিম আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব আমরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারবো না। তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দেওয়া নৌকা তোমরা নেয়ে যাও। শুধু তাই নয় তারা নৌকা ভেঙে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে তাদের আদি কৃষ্টি কালচার এখন আর আগের মতো নেই। আধুনিকতার ছোবলে অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। বাংলায় আগত শতশত পীর আউলিয়ার মত বেদেদের পূর্বপুরুষও সূদুর ইয়েমেন থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই ভূমিতে এসেছিলেন।

যদিও আজ তারা ইসলামের সেই শিক্ষা, সামাজিকতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তাই আমাদের উচিত তাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের সেই চেতনাকে পূনরজ্জীবত করা। ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দানের মাধ্যমে জীবনকে স্বাভাবিক ও সামাজিক করার চেষ্টা করা। কারণ তারাও আমাদের মুসলিমদের একটা অংশ। আর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মুসলিম উম্মাহ তো একটি শরীরের মত।

আমাদের উচিত সেই সকল আত্নত্যাগী সুফী সাধকদের জীবনীকে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা। তাদের ধৈর্য্য, সংযম ও দাওয়াতি জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে কাজে লাগানো এবং তাদের মত করে ইসলামের সুমহান শাসশত্ব বাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।

অধ্যায় ৭ : উপসংহার

বখতিয়ার খলজির বিজয়ের বহু পূর্বেই আরব বণিকরা চট্টগ্রামের উপকূলে গড়ে তুলেছিলেন ঘর-বসতি।বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ভেসে আসা দূর-দূরান্তের মুসলমান নাবিকদের আনাগোণা, *সাবত-ই-গাঙ* থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি—সবই এ ভূখণ্ডের সাথে আরবের এক নীরব, গভীর নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে আগত পীর-দরবেশগণ দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও মাটির ঘ্রাণকে আপন করে নিয়ে ইসলামের দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অগণিত মানুষের হৃদয়ে। তারা ছিলেন অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার আশার প্রদীপ, দাসত্বে জর্জরিত মানুষের মুক্তির বার্তাবাহক।

তাঁরা সাম্রাজ্য স্থাপনের লোভে কিংবা শাসনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আসেননি —বরং এসেছিলেন এই দেশের মানুষকে আলোর পথে ডাকতে, সত্যের সন্ধান দিতে, এক আল্লাহর প্রতি সমর্পণের মহিমা পৌঁছে দিতে।

নদী-নালা, কাঁদামাটি ও বন-বনানীর এই ভূখণ্ডে তাঁরা এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে, বাংলার মানুষ তাঁদেরকে আপনজনের মতোই বরণ করে নেয়। আজকে আমরা যারা জন্মগত মুসলিম পরিচয় ধারণ করি—তা মূলত তাদেরই দাওয়াতি শ্রম, সাধনা ও ত্যাগের ফল। অনেকে তাঁদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন এই দেশকে কুফর-শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে। এদেশের পবিত্র মাটিতেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে আছেন।

তাঁদের দাওয়াতি জীবনের প্রতিটি পরতে লুকিয়ে আছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অমূল্য রত্নভাণ্ডার। সেই পাথেয় সংগ্রহ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই হতে পারে আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণের জোরালো ভিত্তি। কারণ দেশের প্রত্যন্ত ও সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে ইতোমধ্যেই মিশনারিদের কূটচক্র বিস্তার লাভ করছে; হিন্দুত্ববাদী শক্তির শকুনি-দৃষ্টি বারো আউলিয়ার পবিত্র ভূমিকে আঘাত করতে উদগ্রীব। এমন বাস্তবতায় আমাদের ঈমানি চেতনা জাগ্রত করতে, সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনতে—বাংলায় আগত পীর-আউলিয়াগণের জীবন ও দাওয়াতি কার্যক্রম থেকেই আমরা খুঁজে পাব সর্বাধিক কার্যকর পথনির্দেশ। তাঁদের শিক্ষাই হতে পারে আত্মশুদ্ধি, নৈতিক শক্তি ও আল্লাহমুখী জীবনের সর্বোত্তম আলো।

রেফারেন্স

1. আবদুল মান্নান তালিব - বাংলাদেশে ইসলাম।

2. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ - মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

3. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)।

4. মাহবুবুল আলম - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

5. ড. আব্দুল করিম - চট্টগ্রামে ইসলাম।

6. ড. গোলাম সাকলায়েন - পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক।

7. মোহাম্মদ আখতার হোসেন - বাংলাদেশের জনজীবনে ওলি আউলিয়া ও পীর সম্প্রদায়ের অবদান।

8. নীহাররঞ্জন রায় - বাঙ্গালীর ইতিহাস।

9. মুসা আল হাফিজ -শতাব্দীর চিঠি।

10. Travels of Ibn Battuta।

11. Rhys Davids (1903)।

12. D. C. Sircar (1971)।

13. S. K. Saraswati (1975)।

14. Banglapedia—National Encyclopedia of Bangladesh।